একজন মায়াবতী

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

একজন মায়াবতী 3
ঘুমাবার আগে আয়নায় 37
খবরের কাগজে লিখেছে শৈত্যপ্রবাহ 45
উড কিং-এর মালিক বদরুল আলম 59
স্যার আপনি কেমন আছেন 74
জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন....................92
বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন....................122
ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে....................142
জাহানারা মাছ কুটছিল 154
টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল....................159
আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা 166
দরজার কড়া নড়ছে 183
বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি....................190

থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের মালিকানা বদল 196
অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে..205
মইন বারান্দায় 221
ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার..230
মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়..235

একজন মায়াবতী

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করে শব্দ শুনল–আবার লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। এর মধ্যেই মাথার পাশে রাখা ঘড়ি দেখে নিয়েছে–সাতটা দশ। মনজুর নিজেকে একজন বুদ্ধিমান লোক মনে করে। কোনো বুদ্ধিমান লোক পৌষ মাসে ভোর সাতটা দশে লোপের ভেতর থেকে বেরুতে পারে না।

যে কড়া নাড়ছে সে যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আরো কয়েকবার কড়া নেড়ে চলে যাবে। পাঁঠা শ্রেণীর হলে যাবে না। বিপুল উৎসাহে কড়া নাড়তেই থাকবে। নাড়ুক, ইচ্ছে হলে দরজা ভেঙে ফেলুক। হু কেয়ারস? এখন লেপের ভেতর থেকে বের হওয়া যাবে না।

মনজুর গত রাতে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। ঘুমাতে গেছে তিনটা কুড়িতে। ঘুম ভালো হয় নি, কারণ ঘুমাতে গেছে ক্ষিধে নিয়ে। রাত জাি‌গলেক্ষিধে পায়। শরীরের জন্যে বাড়তি কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যবস্থা ঘরে থাকে–দু তিন রকমের জেলী এবং পাউরুটি। কাল রাতে জেলী ছিল–পাউরুটি ছিল না। বিস্কিটের টিনে কিছু বিস্কিটের গুঁড়া পাওয়া গেল। এক চামচ মুখে দিয়ে মনে হলো সাবানের গুড়া খাচ্ছে। নাড়িভূঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। কতদিনকার বাসি কে জানে। পানি এবং চিনির কোটার শেষ দু চামচ চিনি খেয়ে পেট ভরিয়ে ঘুমাতে গেছে, চোখ প্রায় ধরে এসেছে এমন সময় বাথরুম পেয়ে গেল। ভারপেট পানি খেয়ে ঘুমাতে যাবার এই হলো সমস্যা। বাথরুম পাচ্ছে তবে সেই

তাগিদ জোরালো নয়, উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। শীতের রাতে লেপের ভেতর একবার ঢুকে পড়লে বেরুতে ইচ্ছা করে না।

এখনো খটখট শব্দ, হচ্ছে।

গাধা নাকি? গাধা তো বটেই–অতি নিম্নমানের গাধা। গাধা সমাজের কলঙ্ক। মনজুর লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, ‘ইউ স্টুপিড অ্যাস। ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।’ এটি মনজুরের অতি প্রিয় গালি। সে শিখেছে বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেড স্যারের কাছে। ক্লাস চলাকালীন সময়ে মনজুর কী কারণে জানি হেড স্যারের ঘরে ঢুকেছিল। তাকে দেখে স্যার হুঙ্কার দিলেন, ‘ইউ স্টুপিড অ্যাস, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।’ ইংরেজি গালি বাচ্চা ছেলে বুঝতে পারবে কিনা তার হয়তো সন্দেহ হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ বাংলা তরজমাও করে দিলেন, ‘ওহে বোকা গাধা, এখানে তোমার কোনো কর্ম নাই।’

মনজুর হেড স্যারের ইংরেজি গালি সাধারণত মনে মনে দেয়। তবে এখন উঁচু গলায় দেয়া যেতে পারে। শোবার ঘর থেকে যাই বলা হাক, বাইরে থেকে কিছু শোনা যায় না। সে হয়তো তার স্যারের মতো গালির বাংলা তরজমাও করত। কিন্তু সে বুঝতে পারছে তাকে বিছানা ছাড়তেই হবে, তলপেটে চাপ পড়ছে, বাথরুমে না গেলেই নয়। কাল রাতে বাথরুম পেয়েছিল, সে বাথরুমে না গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে দু গ্লাস পানি ঘুমাবার আগে খেয়েছিল তার পুরোটাই এখন একটি কিডনিতে জমা হয়েছে। সাধারণ নিয়মে দুটি কিডনিতে জমা হবার কথা–সে সাধারণ নিয়মের বাইরে–তাঁর একটি মাত্র কিডনি। ডান দিকের কিডনি সাত বছর আগে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। বাঁ দিকেরটাও সম্ভবত যাই-যাই করছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয়। চোখে অন্ধকার দেখার মতো ব্যথা। মিলিটারি ডাক্তার

ব্রিগেডিয়ার এস মালেক গত মাসে হাসি হাসি মুখে বললেন, outlook not so good. মিলিটারি ডাক্তাররা বোধহয় সাধারণ ডাক্তারদের চেয়ে বোকা হয়। বোকা না হলে এই জাতীয় কথা হাসিমুখে বলে কী করে?

একজন হাসিমুখে কিছু বললে অন্যজনকেও হাসিমুখে জবাব দিতে হয়। মনজুর হাসি মুখে বললেন, Outlook not so good বলতে কী মিন করছেন?

ডাক্তার সাহেবের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। তিনি বললেন, কিডনি যেটা আছে মনে হচ্ছে সেটাও ফেলে দিতে হবে। সিমটম্‌স্‌ ভালো না।

মনজুরের বুক শুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তবু মুখে হাসি ধরে রাখল। হাসাহাসি দিয়ে যে বাক্যবিন্যাস শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করার কোনো মানে হয় না!

যেটা আছে সেটাও ফেলে দিতে হবে? বলেন কী? হা–হা–হা-হা।

মিলিটারি ডাক্তার এই পর্যায়ে হকচাকিয়ে গেলেন। সরু গলায় বললেন, হাসছেন কেন? আপনার শরীর থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ফেলে দিতে হচ্ছে এর মধ্যে হাসির কী Cicer What is so funny about it?

মনজুরের গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি হাসছি তোর সঙ্গে তাল দিয়ে আর & Gift What is so funny about it?

এখনো কড়া নড়ছে।

খুব কম হলেও ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরে ধাক্কাধাক্কি চলছে। দুটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে-এক, ভিখিরি, যে ঠিক করেছে ভিক্ষার বউনি এই বাড়ি থেকে শুরু করবে। কিছু না নিয়ে যাবেই না। দুই. তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ। মীরা হয়তো তার কোনো খালাতো, চাচাতো কিংবা মামাতো ভাইকে পাঠিয়েছে। বলে দিয়েছে–'দেখা না করে আসবি না।' কাজ হচ্ছে সেইভাবেই। গাধাটা খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। মনজুর বিছানা থেকে নামতে নামতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল–এটা কেমন করে সম্ভব যে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক গাধা ধরনের? শুধু যে স্বভাবের গাধা তাই না, চেহারাতেও গাধা। জহির নামে মীরার এক খালাতো ভাই আছে যার কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখও লম্বাটে। ঐ ব্যাটাই এসেছে নাকি?

কে?

জ্বি আমি।

আমিটা কে?

স্যার আমি কুদ্দুস।

কুদ্দুস মনজুরের অফিসের পিওন। সাত সকালে সে এখানে কেন? মনজুর কি তাকে আসতে বলেছিল? মনে পড়ল না। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। কিডনির সঙ্গে কি স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে? মনজুর দরজা খুলল।

ব্যাপার কী কুদ্দুস?

স্যার আমার ছাােট বাােনটা গত রাত্রে মারা গেছে।

মনজুর তাকিয়ে রইল।

ভোরবেলা কেউ মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এলে তাকে কী বলতে হয়? সান্ত্বনার কথাগুলো কী? বলার নিয়মটাই বা কী? মনজুর খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কুদ্দুস ভিতরে আস। ভেরি স্যাড নিউজ। ইয়ে কী যেন বলে ... কাঁটার সময় মারা গেছে?

রাত আড়াইটার সময় স্যার।

মনজুরের নিজের উপরই রাগ লাগছে। কাঁটার সময় মারা গেছে সেই খবরে তার দরকার কী? আড়াইটার সময় সে কী করছিল? বিস্কিটের গুড়া খাচ্ছিল বলে মনে হয়।

কুদ্দুস মাথা নিচু করে বলল, কিছু টাকা দরকার ছিল স্যার। হাত একেবারে খালি।

মনজুর স্বস্তি বোধ করল। সান্ত্বনা দেবার চেয়ে টাকা দেয়া অনেক সহজ। সান্ত্বনা দেয়ার অসংখ্য পথ আছে, টাকা দেয়ার একটাই পথ। মানিব্যাগ বের করে হাতে দিয়ে G

কত টাকা দরকার?

স্যার আমি তো জানি না। লাশের খরচপাতি আছে। দেশে নিয়া গোর দেয়ার ইচ্ছা! ছিল; সেটা পারব না। সবই স্যার কপাল।

হাজার খানিক দিলে হয়?

দেন স্যার।

আস, ভিতরে এসে বস। নাম কী ছিল তোমার বোনের?

সাবিহা।

ও আচ্ছা, সাবিহা।

মনজুর আবার নিজের উপর বিরক্ত হলো। নাম কী' প্রশ্নটা সে শুধু শুধু কেন করল? নাম দিয়ে তার দরকার কী? মূল কথা হচ্ছে বেচারি মারা গেছে। তার নাম সাবিহা হলেও যা ময়ূরাক্ষী হলেও তা। অবিশ্যি ময়ূরাক্ষী নাম হলে এক পলকের জন্য হলেও মনে হত- 'আহা, এত সুন্দর নামের একটা মেয়ে মারা গেল!'

তুমি এই চেয়ারটায় বস কুদ্দুস। জীবন-মৃত্যু হচ্ছে তোমার কী যেন বলে ... উইল অব গড, মানে ইয়ে ... দেখি টাকাটা নিয়ে আসি।

মানিব্যাগে আছে মাত্র একশ আশি টাকা। টেবিলের ডান দিকের ড্রয়ারে আছে নবাবুই টাকা–এতো দেখি বিরাট বেকায়দা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালার কাছে চাইলে কি পাওয়া যাবে?

সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাকে এই মাসের ভাড়াই দেওয়া হয় নি। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা, আজ বার তারিখ।

কুদ্দুস।

জ্বি স্যার।

মানে একটা সমস্যা হয়ে গেল। ঘরে এত টাকা নেই। এখানে অল্প কিছু আছে। সরি, আমি ভেবেছিলাম... কুদ্দুস তুমি চা-টা কিছু খেয়েছ?

জ্বি না। স্যার।

বস, চা খেয়ে যাও। শুধু চা— একা থাকি। ঘরে নাশতার কোনাে ব্যবস্থা নেই। রেস্টুরেন্টে নাশতা খাই। বরং তুমি এক কাজ করা–চল আমার সঙ্গে চা-নাশতা খাও।

লাগবে না স্যার। আমি যাই।

মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা কর। জীবন-মৃত্যুর উপর আমাদের কোনাে ইয়ে নেই। মানে গডস উইল।

আমি স্যার যাই। দেরি হয়ে গেছে।

আচ্ছা যাও।

কুদ্দুস চলে যাবার পর মনজুর চায়ের পানি চড়াল। পানি না চড়ালেও হত। চিনি শেষ হয়ে গেছে, চিনির কোটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা কাল রাতে সে খেয়ে নিয়েছে। আর কোনো কোটায় চিনি আছে কি? সেদিন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা কোটা বের হলো, যার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি চা পাতা'। মীরার কাণ্ড–সে চায়ের কোটার বাইরেও একটা ইমার্জেন্সি কোটা রেখেছে। এই কেটায় সে নিশ্চয় কখনো হাত দেয় না। সেরকম ইমার্জেন্সি চিনি লেখা কোনো কোটা কি আছে? চিনির কোটা পাওয়া গেল না, তবে একটা কোটা পাওয়া গেল। যার গায়ে লেখা–'সমুদ্র। কোটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখার মানে কী? মনজুর রাতে ক্ষিধে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সেই ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। আরেক চামচ বিস্কিটের গুড়া কি খেয়ে নেবে? কুদ্দুসকে টাকা দিতে না পারার অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছু সান্ত্বনার কথা তো তাকে অবশ্যই বলা উচিত ছিল। এইসব পরিস্থিতিতে কী বলতে হয় বা বলতে হয় না। তার উপর বই-টই থাকা উচিত ছিল। বিদেশে নিশ্চয়ই আছে–

"মৃত্যুশোকে কাতর মানুষকে সান্ত্বনা দেবার একশটি উপায়"

আধুনিক মানুষদের জন্যে এ জাতীয় বই খুবই প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বই-এ বাজার ভর্তি, প্রয়োজনীয় বই খুঁজলে পাওয়া যায় না। কথা বলার আর্টের উপরও একটা বই থাকা দরকার। কেউ কেউ এত সুন্দর করে কথা বলে, কেউ কথাই বলতে পারে না। যখন মজার কোনো গল্প বলে তখন ইচ্ছা করে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

বর্তমানে সময়টা হলো কথা-নির্ভর। অথচ সেই কথাই লোকজন গুছিয়ে বলতে পারছে না। কথা বলার উপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটা কোর্স থাকলে ভালো হত। ইনস্ট্রাকটারদের কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে না, তবে কথা বলার ব্যাপারে তাদের হতে

হবে এক একজন এক্সপার্ট। যেমন মীরা। মনজুরের ধারণা, মীরার মতো গুছিয়ে এবং সুন্দর করে কোনো মেয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথম দিনে খানিকক্ষণ কথা বলার পর মীরা বলল, আপনার নামের প্রথম অক্ষর এবং শেষ অক্ষর দিয়ে আমার নাম–এটা কি আপনি লক্ষ করেছেন? মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, এখন লক্ষ করলাম। আগে করি নি।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, নামের এই মিল কী প্রকাশ করে বলতে পারেন?

জ্বি না।

চিন্তা করে দেখুন তো বের করতে পারেন। কিনা। যদি বের করতে পারেন। তাহলে টেলিফোন করে জানাবেন। যদি বের করতে না পারেন তা হলে টেলিফোন করবেন না।

মনজুর তৃতীয় দিনে টেলিফোন করল। সে কে, তার কী নাম কিছুই বলতে হলো না। হ্যালো বলতেই মীরা বলল, ও আপনি? রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছেন?? জানতাম আপনি পারবেন।

মনজুর কাঁচুমাচু গলায় বলল, জ্বি না, পারি নি।

পারেন নি তাহলে টেলিফোন করলেন যে?

আপনার কাছ থেকে জানার জন্যে। আচ্ছা, আপনাকে আরো সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাতদিন পরেও যদি না পারেন তাহলে বলে দেব। রাখি, কেমন?

মনজুর অনেক কিছু ভাবল–নামের মিল কী বুঝাচ্ছে? চার অক্ষরের দুটি মিলে যাচ্ছে। প্রথমটি এবং শেষটি। তাতে কী হয়? আদৌ কি কিছু হয়?

সাতদিন পর মীরার সঙ্গে আবার কথা হলো। সে হাসতে হাসতে বলল, এখনো পারেন নি? এত সহজ আর আপনি পারছেন না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিম্ন পর্যায়ের। আমার মেজ মামার ধারণা আমি গাধা-মানব।

তাই তো দেখছি।

মিলটা কী দয়া করে যদি বলেন...

মীরা হাসতে হাসতে বলল, ঠিক করে বলুন তো আপনার আগ্রহ কি মিল জানার জন্যে না আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে?

মনজুর গুছিয়ে কথা বলতে পারলেও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হঠাৎ করে কোনো জবাব এল না।

মীরা বলল, হ্যালো, কথা বলছেন না কেন? আপনি অ্যামবারাসড় বোধ করছেন?

জ্বি না।

মনে হচ্ছে আপনি অ্যামবারাসড়। সরি, আমি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। রাখি, কেমন? পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

মনজুর দুধ চিনিবিহীন চা নিয়ে বিছানায় বসল। আশ্চর্য, টেলিফোনে কুঁ-কুঁ-পিঁড়িং জাতীয় শব্দ হচ্ছে! ব্যাপারটা কী? মনজুর অবাক হয়ে তাকাল। গত দুমাস ধরে টেলিফোন ডেড। বিলের টাকা জমা না দেয়ায় লাইন সম্ভবত কেটে দিয়েছে। টেলিফোন অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোন ছাড়া তার খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তাও না। বরং এক রকম আরামই অনুভব করছে।

টেলিফোনে আবার কুঁ-কুঁ শব্দ। আপনা। আপনি ঠিক হয়ে গেল নাকি! এ দেশে সবই সম্ভব। যে নিয়মিত বিল দিয়ে যায়। তার লাইন কাটা যায়। আর তার মতো ডিফল্টারদের কাটা লাইন আপনা। আপনি মেরামত হয়ে যায়।

মনজুর রিসিভার তুলে কোমল গলায় বলল, হ্যালো। হ্যালো।

ওপাশ থেকে আট ন বছর বয়সী বালকের গলা শোনা গেল

হ্যালো বড় চাচু?

আমি বড় চাচু না খোকা–তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো, আপনি কে?

আমার নাম মনজুর।

সূচিপত্র

মনজুর চাচু?

তাও বলতে পারে। তুমি স্কুলে যাও নি?

উঁহু।

কেন বল তো?

আমার জ্বর।

বল কী, একটু আগে তো বললে–তুমি ভালো!

ছেলেটা হকচাকিয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিলে ছোটরা অসম্ভব লজ্জা পায়।

নাম কী তোমার খোকা?

ইমরুল।

ইমরুল? সর্বনাশ, তুমি যখন একটু বড় হবে সবাই তোমাকে কী বলে ক্ষ্যাপাবে জান? সবাই বলবে–ভিমরুল।

ভিমরুল কী?

ভিমরুল কী বলার আগেই টেলিফোন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একেবারেই ঠাণ্ডা। শোঁ-শোঁ–পি-পি কোনো আওয়াজ নেই। টেলিফোনটা ঠিক থাকলে মীরাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যেত।—কৌটার গায়ে ‘সমুদ্র’ লেখা কেন? উত্তরে মীরা তার স্বভাব মতো বলতো–তুমি আন্দাজ কর তো কেন?

আমি পারছি না।

তবু চেষ্টা করা। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।

আধুনিক জগতের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে আছে–রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন ... অষ্টম আশ্চর্য (মনজুরের মতে) তার সঙ্গে মীরার বিয়ে। যাকে বলে হুলস্থূল বিবাহ। মীরার বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মনসুর উদ্দিন এক হাজার লোককে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতি লোকজনদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মন্ত্রী। ফ্ল্যাগ দেয়া গাড়ি করে এসেছিলেন। তারা কিছুই খেলেন না। তাদের মধ্যে মাত্র একজন মনজুরের সঙ্গে হ্যাঁন্ডশেক করে বললেন, হ্যালো ইয়াং ম্যান। বেষ্ট অব ইওর লাক।

বাসর হলো মীরার বড় ভাইয়ের বাসায়। বিছানার উপর বেলি ফুলের যে চাদর বিছানো তার দামই নাকি দুহাজার টাকা।

মীরা বাসর রাতে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্ছে–এই বিছানার বিশেষত্ব কী বল তো?

মনজুর কিছু বলতে পারল না।

কী–বলতে পারলে না? এটা হচ্ছে ওয়াটার বেড। বাংলায় জল-তোশক বলতে পার। এখানে ঘুমালে মনে হবে পানির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।

বল কী!

ভাইয়া আমেরিকা থেকে আনিয়েছে। সে খুবই শৌখিন। বেচারা নিজে অবশ্যি এই বিছানায় ঘুমাতে পারে না। ওর পিঠে ব্যথা। ডাক্তার নরম বিছানায় শোয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বেচারা ঘুমায় মেঝেতে পাটি পেতে। বাধ্য হয়ে ভাবিকেও তাই করতে হয়। একে বলে পোয়েটিক জাসটিস। আচ্ছা, তুমি এমন মুখ ভোঁতা করে বসে আছ কেন? কথা বল।

কী কথা বলব?

কী কথা বলবে সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ইন্টারেটিং কোনো কথা বল। বুঝড়ের কথা বাকি জীবনে অসংখ্যবার মনে করা হবে–কাজেই কথাগুলি খুব সুন্দর হওয়া উচিত।

মনজুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?

মীরা হেসে ফেলে বলল, তোমার প্রথম কথা আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা কী?

ফুলের গন্ধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফুলগুলোকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?

না। আর কিছু বলবে?

ইন্টারেস্টিং আর কিছু তো মনে আসছে না। তুমি বল, আমি শুনি। বলতে বলতে মনজুর হাই তুলল।

মীরা বলল, তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। গত দুই রাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আমার ছোট্ট বাসা আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে–শোব কী, দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।

খুব বেশি ঘুম গেলে ঘুমিয়ে পড়। বাসর রাতে যে বকবক করতেই হবে এমন কথা নেই।

মশারি ফেলবে না?

দরজা-জানালায় নেট লাগানাে–মশা আসবে না, তাছাড়া ঘরে ফুল থাকলে মশা আসে না। ফুলের গন্ধ মশারা সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি? জানতাম না তো!

ঘুম পেলে শুয়ে পড়।

মনজুর শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার। মনজুরের ধারণা, সবচে’ আরামের ঘুম সে ঘুমিয়েছে বাসর রাতে।

কাফে লবঙ্গ চা খেতে খেতে মনজুর আজ সারাদিনে কী কী করবে। ঠিক করে ফেলল। তার ভিজিটিং কার্ডের উল্টো পিঠে এক দুই করে লিখল,

(১) অফিস, সকাল দশটা।
(২) বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার অফিসে দুপুরের খাওয়া।
(৩) খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা।
(৪) ইদরিসের সঙ্গে ঝগড়া।[সন্ধ্যায়, তাকে তার বাসায় ধরতে হবে।]
(৫) মীরার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। [রাত দশটার পর।]

এই জাতীয় একটা লিস্ট মনজুর প্রতিদিন ভোরেই করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছেলিষ্ট অনুযায়ী কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয় না। তবু লিস্টটা করলে মনে এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায়।

লিষ্টের পাঁচ নম্বরে মীরার সঙ্গে কথা বলা। রাত দশটার পরে তাকে সব সময় পাওয়া যায় না। এগারটার পর হলে মোটামুটি নিশ্চিত যে পাওয়া যাবে। শীতের রাতে এগারটার পর টেলিফোন জোগাড় করাই এক সমস্যা। সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে করা যায়। তবে তার জন্যে বাড়ির ভাড়া ক্লিয়ার করা দরকার। আজ রাতে বাড়িভাড়া নিয়ে

যদি যাওয়া যায় তাহলে উঠে আসার সময় হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, ভাই সাহেব! টেলিফোনটা ঠিক আছে?

উনার টেলিফোন অবশ্যি বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। নিজেই খারাপ করে রাখে। কিনা কে জানে!

তারচে’ এখন চলে গেলে কেমন হয়? মীরাকে ভোরবেলার দিকে সব সময় পাওয়া যায়। মনজুর ভিজিটিং কার্ড বের করে পাঁচ নম্বর আইটেমে টিক চিহ্ন দিল।

মীরা সহজ স্বরে বলল, তুমি এত ভোরে!

মনজুর বলল, ভোর কোথায়। আটটা চল্লিশ বাজে।

কোনো কাজে এসেছ?

ভাবলাম সেপারেশনের টার্মস এন্ড কন্ডিশনসগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি। মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, টার্মস এন্ড কন্ডিশনস মানে? ঠাট্টা করছি নাকি? তোমার রূঢ় আমি কি কিছু চাচ্ছি? তাোমার এমন কাোনাে রাজত্ব নেই অর্ধেক আমাকে দিয়ে

তা ঠিক, তবু আইনের কিছু ব্যাপারস্যাপার আছে।

তার জন্যে তো গত মাসের সাতাশ তারিখে ভাইয়া সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার এম. জামানকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তোমার আসার কথা ছিল, তুমি আস নি।

সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেল।

কী তোমার অফিস আর কী তার জরুরি কাজ! একটা কথা পরিষ্কার করে বল তো– সেপারেশনে তোমার কি ইচ্ছা নেই?

আরে কী বলে! ইচ্ছা থাকবে না কেন? দুজন মিলেই তো ঠিক করলাম। চা খাওয়াতে পার?

মীরা চা আনতে উঠে গেল। তাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের সময় এতটা সুন্দর ছিল না। আলাদা হবার পর থেকে সুন্দর হতে শুরু করেছে। খানিকটা রোগাও হয়েছে। রোগার জন্যেই লম্বা লম্বা লাগছে নাকি? চেহারায় চাপা আনন্দের আভা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মীরা এখন সুখে আছে। সমস্ত চেহারায় মায়াবতী মায়াবতী ভাব। নীল শাড়ির জন্যেও হতে পারে। ধবধবে সাদা ব্লাউজের সঙ্গে নীল শাড়ি পরলে মেয়েদের মধ্যে একটা আকাশ আকাশ ভাবে চলে আসে। শাড়িটা আকাশ, ব্লাউজ হলো পূর্ণিমার চাঁদ। উপমা নিখুঁত হলো না। রাতের আকাশ নীল হয় না। হয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

নাও, চা নাও। চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?

না।

নাশতা খেয়ে এসেছ?

হুঁ।

কোথায় খেলে? তোমার সেই কাফে লবঙ্গ?

হুঁ।

এক অক্ষরে জবাব দিচ্ছি কেন? আমরা আলাদা থাকাছি বলে কথা বলা যাবে না। তা তো না। কী কথা ছিল? সেপারেশনের পরে আমাদের যদি পথেঘাটে দেখা হয় তাহলে আমরা সিভিলাইজড় মানুষের মতো বিহেভ করব।

তা অবশ্যই করব।

এক ধরনের সাধারণ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে থাকবে। তুমি চা খাােচ্ছ না কেন? চিনি বেশি হয়েছে?

না। চিনি ঠিক আছে।

তোমাকে অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। তোমার শরীরে অসুখ অসুখ গন্ধ।

মনজুর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটের কড়া ধোঁয়ায় অসুখ অসুখ গন্ধটা যদি তাড়ানো যায়। মীরার ঘাণশক্তি কুকুরের চেয়েও প্রবল। যখন অসুখ অসুখ গন্ধ বলছে তখন বুঝতে হবে ঠিকই বলছে।

কথার জবাব দিচ্ছে না কেন? অসুখ নাকি?

আরে না। বিনা পেস্টে দাঁত মেজেছি–গন্ধ যা পাচ্ছি। আমার মনে হয় মুখ থেকে পাচ্ছ।

মুখের গন্ধ আমি চিনি। তোমার গা থেকে জ্বর জ্বর গন্ধ আসছে। সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছ।

হেভি টেনশনে থাকি। সিগারেটের ধোয়ার উপর দিয়ে টেনশানটা পার করার চেষ্টা করি।

কীসের এত টেনশান?

আছে অনেক। আচ্ছা তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি, ধর একজন লোকের খুব নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে। তাকে সান্তনা দিতে হবে। কী বলে সান্ত্বনা দিবে?

কে মারা গেছে?

কে মারা গেছে সেটা জরুরি না। কী কথা বললে সে সান্ত্বনা পাবে সেটা বল।

কোনাে কথাতেই সে সান্ত্বনা পাবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাক তাহলে খানিকটা সাত্ত্বিনা পেতে পারে।

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। বসে রইল; মনজুর বলল, আজ উঠি।

মীরা বলল, তুমি না। টার্মস এন্ড কন্ডিশনস নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলে? এখন চলে যা্েচ্ছ যে?

আরেকদিন আলাপ করব। অফিসের সময় হয়ে গেল।

এ মাসের কুড়ি তারিখে কি তুমি আসতে পারবে? কুড়ি তারিখ বুধবার। সন্ধ্যা সাতটার পর। পারবে আসতে?

পারব।

তাহলে ঐ দিন জামান সাহেবকে আসতে বলব।

জামান সাহেবটা কে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? লইয়ার।

ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই আসব। অফিসে গিয়েই ডায়েরিতে লিখে রাখব। এবার আর ভুল হবে না। তবে সেইফ গাইড থাকার জন্যে তুমি বুধবার সকালেই একটা টেলিফোন করে দিও। পারবে না? টেলিফোন নাম্বারা আছে না?

আছে।

মনজুর বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার–এ বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় প্রতিবার চৌকাঠে ধাক্কা খায়।

এর কারণটা কী কে জানে? এই ঘর তাকে পছন্দ করে না–নাকি দরজা তাকে পছন্দ করে না?

এই জগতে জড় বস্তুর কি পছন্দ-অপছন্দ আছে?

রাস্তায় নেমে মনজুরের মনে হলো, আসল জিনিসটাই মীরাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখা কেন? আবার কি ফিরে যাবে? না-থাক।

দিলকুশা এলাকায় মনজুরের অফিস। এগার তলার ছটি কামরা। ফ্লোর স্পেস আট হাজার স্কয়ার ফিট। অফিসের নাম থ্রি-পি কনস্ট্রাকশনস। কোম্পানির মালিক নুরুল আফসার মনজুরের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে নুরুল আফসারের নাম ছিল–মিডা কাচামরিচ। ছেলেবেলাতেই লক্ষ করা গেছে। নুরুল আফসার চট করে রেগে যায়, তবে রেগে গেলেও অতি মিষ্টি ব্যবহার করে। মিডা কাচামরিচ নামকরণের এই হলো রহস্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মনজুর ভর্তি হলো জগন্নাথ কলেজে। নুরুল আফসার চলে গেল। আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ লিটারেচর পড়তে। সায়েন্স পড়তে তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ক্রিয়েটিভ লিটারেচারের ক্লাসগুলি তার খুবই পছন্দ হলো। প্রথম সেমিস্টারে খুব খেটে খুটে সে একটা অ্যাসাইনমেন্টও জমা দিল। মুম্বইটা হচ্ছে ভিন্ন হাজার শব্দে সেই জোসেফ সেমিটিয়ারির একটি বর্ণনা দিত হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার দিন পাঁচেক পর কোর্স কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ক্লার্ক ব্লেইস তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার রচনা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। It is interesting.

তোমার পছন্দ হয়েছে?

ইন এ ওয়ে হয়েছে। তুমি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছ। মোট কাটি কবর আছে লিখেছি। কে কবে মারা গেছে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করেছ। কবরখানা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কত তা দিয়েছ–যাকে বলা যায় পারফেক্ট ফটোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন।

থ্যাংক ইউ।

কিন্তু সমস্যা কি জান–এই রচনা প্রমাণ করেছে তোমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব। অন্য কিছু পড়তে। যেমন ধর ইনজিনিয়ারিং।

তোমার ধারণা ইনজিনিয়ারদের ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন নেই?

অবশ্যই আছে। তাদের যতটুকু ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন তোমার তা আছে।

নুরুল আফসার ছবছর আমেরিকায় কাটিয়ে সিভিল ইনজিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি, আমেরিকান স্ত্রী পলিন এবং দুই যমজ কন্যা পেত্রিসিয়া ও পেরিনিয়াকে নিয়ে দেশে ফিরল। চাকরির চেষ্টা করল বেশ কিছুদিন–লাভ হলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে খুলল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। স্ত্রী এবং দুই কন্যার আদ্যক্ষর নিয়ে কোম্পানির নাম হলো Three P.

মনজুর জন্মলগ্ন থেকেই এই কোম্পানির সঙ্গে আছে। নুরুল আফসার শুরুতে বলেছিল, বেতন দিতে পারব না–পেটেভাতে থাকবি, রাজি থাকলে আয়। যদি কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায় তুই তোর শেয়ার পাবি। আমি তোকে ঠকাব না। বিশ্বাস কর ঠকাব না।

কোম্পানি বড় হয়েছে। ফুলে-ফেঁপে একাকার। গত বছর দু কোটি টাকার ব্যবসা করেছে– এ বছর আরো করবে। অফিস শুরু হয়েছিল তিনজনকে নিয়ে, আজ সেখানে একশ এগারজন কর্মচারী। মনজুরের হাতে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই। চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে দেখে। পি.আর.ও. বলা যেতে পারে। প্রতি মাসে তার একাউন্টে আট হাজার টাকা জমা হয়। তার চাকরির শর্ত কী, দায়িত্ব কী এই নিয়ে নুরুল আফসারের সঙ্গে তার কখনো কথা হয় না।

অফিসঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে মনজুরের ঘর। কামরাটা ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়ালে পালতোলা নীেকার একটি পেইন্টিং আছে। ঘরের এক প্রান্তে ডিভানের মুতো আছে। ডিভানের পাশেই বুক শেলফে বেশ কিছু বাংলা বই যার বেশিরভাগই কবিতা। তার কোনো কাব্যপ্রীতি নেই। কবিতার বইগুলো মীরা কিনে দিয়েছে। ডিভানে শুয়ে শুয়ে আজকাল সে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা উল্টায় এবং ভ্রু কুঁচকে ভাবে–লোকজন কি সত্যি আগ্রহ করে কবিতা পড়ে? যদি পড়ে তাহলে কেন পড়ে?

মনজুরের ঘরে গত পনের দিন ধরে বসছে জাহানারা। জাহানারা টাইপিষ্ট হিসেবে তিন মাস আগে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। বসার কোনো জায়গা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় বসছে। বড় সাহেব নুরুল আফসারের পাশেই হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে নতুন ঘর তার জন্যে তৈরি হবার কথা। যতদিন হচ্ছে না, ততদিন জাহানারা মনজুরের ঘরে

বসবে। এই ঠিক হয়েছে। ব্যবস্থাটা মনজুরের পছন্দ হয় নি। একটি অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ে ঘরে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই থাকে। সহজ হওয়া যায় না। ডিভানে গা এলিয়ে কবিতার বইয়ের পাতা উল্টানোও সম্ভব না। তারচেয়েও বড় কথা মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মুখে কিছুই বলে না। তবে মনজুর লক্ষ করেছে সিগারেট ধরলেই জাহানারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মনজুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কী খবর জাহানারা?

জ্বি স্যার, খবর ভালো।

মুখ এত গভীর কেন?

জাহানারা হাসল। সে এখনো দাঁড়িয়ে। বসতে না বলা পর্যন্ত সে বসবে না।

বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার ঘর আজ তৈরি হয়ে যাবার কথা না?

ঘর তৈরি হয়েছে স্যার।

তাহলে আর এখানে কেন, নতুন ঘরে যাও। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক।

আপনাকে বলে তারপর যাব, এই জন্যে বসে আছি।

ভেরি গুড়। বড় সাহেব কি এসেছেন নাকি?

জ্বি না। স্যার। উনি আজ আসবেন না। চিটাগাং যাবেন।

জাহানারা হ্যান্ডব্যাগ খুলে মুখবন্ধ খাম বের করল। নিচু গলায় বলল, স্যার আপনার টাকাটা। বলতে বলতে জাহানারার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল–মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের কপালে দুঃখ আছে। এরা নিজেরা সমস্যা তৈরি করে এবং অন্যের তৈরি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি এত দ্রুত করার দরকার ছিল না। নিশ্চয়ই নানান ঝামেলা করে তাকে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। মনজুর বলল, তোমার এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তুমি আরো পরে দিও। আর পুরো টাকাটা একসঙ্গে দেবারও দরকার নেই। তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিও।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আর শোন, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই টাকা পয়সা ধার করতে হয়। এত লজ্জা পাওয়ার তো এর মধ্যে কিছু নেই। আমাদের যে বড় সাহেব, তিনিও ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ধার নিয়েছেন।

জাহানারা হেসে ফেলল।

মনজুর বলল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

অবশ্যই পারব। কী কাজ স্যার?

আমি এই মাসের বেতন তুলি নি। একটা চেক দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার সাহেবকে বল ভাঙিয়ে দিতে।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

আর বরুণ বাবুকে বল, আমাদের অফিসের একজন পিওন আছে–আব্দুল কুদ্দুস নাম, জেনারেল ফাইল দেখে তার ঠিকানা বের করতে। ও আজ সকালে কিছু টাকার জন্যে এসেছিল। দিতে পারি নি। ওর একটা বোন মারা গেছে।

জাহানারা চলে গেল।

মনজুরের টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অর্থাৎ করার কিছুই নেই। মনজুর দুমাস ধরেই লক্ষ করছে, তার টেবিলে কোনো ফাইল আসছে না। বড় সাহেব কি তার টেবিলে ফাইল না পাঠানোর কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? এমন না যে অফিসে কোনো কাজকর্ম নেই। বরং উল্টো। কাজকর্মের চাপ অনেক বেশি। শুধু তার টেবিলেই কিছু নেই। এটা নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীরে এক ধরনের আলস্য এসে গেছে। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করে না। যা হবার হবে এরকম একটা ভাব চলে এসেছে এবং তা এসেছে খুব সম্ভব মীরার কারণে। মীরা চলে না গেলে হয়তোবা এ ধরনের আলস্য আসত না।

মনজুর মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল। আজ দিনে করণীয় কাজের পাঁচটির মধ্যে দুটি করা হয়ে গেছে। অবশ্যি এর মধ্যে আরেকটি যুক্ত হয়েছে।—কুদ্দুসকে টাকা দেয়া। কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠাতে হবে; নাকি নিজেই চলে যাবে? কুদ্দুসের গায়ে হাত

রেখে কিছুক্ষণ সন্তুনা দিয়ে চলে আসবে? সন্ধ্যার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত তিন নম্বর আইটেমটির ব্যবস্থা করা যাক। তিন নম্বর আইটেম হচ্ছে–খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা (যেহেতু আগের দুটি চিঠি পান নি)। মনজুর কাগজ-কলম নিয়ে বসল। একটা দীর্ঘ চিঠি লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বসা। হবে অবশ্য উল্টোটা–ছোট্ট চিঠি লেখা হবে। কয়েক লাইন লেখার পরই মনে হবে–আর কিছু লেখার নেই। শ্রদ্ধেয়া খালা,

আমার সালাম জানবেন। আমি নিয়মিত আপনার চিঠি পাচ্ছি। মনে হয় আপনি আমার চিঠি পাচ্ছেন না।

আমি ভালোই আছি বলা চলে। তবে যে কিডনিটি এখনো অবশিষ্ট আছে তাতে বোধহয় কিছু সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার মনগড়াও হতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র কিডনি অবশিষ্ট সেহেতু কিছু হলেই মনে হয়। কিডনি বুঝি গেল। আপনি শুধু শুধু চিন্তা করবেন না। আপনার আবার অকারণ চিন্তা করার অভ্যাস।

খালুজানকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি

আপনার মনজু

চিঠি ছোট হবে আগেই বোঝা গিয়েছিল, এতটা ছোট হবে তা বোঝা যায় নি। পুরো পাতাটা খালি খালি লাগছে। পুনশ্চ দিয়ে আরো কয়েকটা লাইন না। ঢুকালেই না। কী লেখা যায় সেটাই সমস্যা।

পুনশ্চ : ঢাকায় এবার অসম্ভব শীত পড়েছে। আপনাদের এদিকে শীত কেমন? নীতু কেমন আছে? তার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?

নীতুিকে একটা আলাদা চিঠি দেয়া উচিত ছিল। বেচারা প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি দেয়– কখনো সেইসব চিঠির জবাব দেয়া হয় না। তাতে নীতুর উৎসাহে ভাটা পড়ে না। শিশুদের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তারা প্রতিদান আশা করে কিছু করে না। কখনো না। বড়রাই সবসময় প্রতিদান চায়।

মনজুরের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এই টেলিফোন সেটে কোনো গণ্ডগোল আছে। তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। মাথা ধরে যায়।

হ্যালো।

মনজুর কেমন আছিস তুই?

মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বড় সাহেবেব গলা। একই সঙ্গে তার ছেলেবেলার বন্ধু এবং বস। টেলিফোনে নুরুল আফসারের গলা–ইমরুল নামের ঐ ছেলেটির গলার মতোই লাগছে। কেমন যেন অভিমান মেশা।

কী-রে কথা বলছিস না কেন? কেমন আছিস?

ভালো।

তোর বাসার টেলিফোন নষ্ট নাকি? কয়েকবার টেলিফোন করেছিলাম, ভোঁ-ভো শব্দ হয়।

টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে।

ঠিক করা। চারপাশে মৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস করার কোনাে মানে হয়? মানুষ মরে গেলে কিছু করা যায় না-যন্ত্রপাতি মরে গেলে তাদের বাঁচানো যায়।

এইকথা বলার জন্যেই টেলিফোন করেছিস–না আরো কিছু বলবি?

হ্যাঁ বলব। মীরা নাকি তোকে ছেড়ে চলে গেছে?

হুঁ।

ব্যাপারটা ঘটল কবে?

এই ধর দিন বিশেক।

আমি তো কিছুই জানতাম না। আজ জালাল সাহেব আমাকে বললেন–মীরার বড় ভাই। চিনতে পারছিস?

হ্যাঁ পারছি।

তাঁকে খুব খুশি দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তোর কোনো গণ্ডগোল ছিল নাকি?

না।

এত চমৎকার একটা মেয়ে ধরে রাখতে পারলি না? তুই তো বিরাট গাধা।

মীরাও আমাকে ধরে রাখতে পারল না–তাকেও কি মহিলা গাধা বলা যায় না?

তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।

নুরুল আফসার লাইন কেটে দিলেন।

মীরার সঙ্গে মনজুরের পরিচয় নুরুল আফসারের মাধ্যমে। মীরার বাবা মনসুরউদ্দিন, কুল অফসারের আপন ৰূপা। সে-ই মনসুরউদিনের কাছে মনজুর একটা চিঠি নিয়ে

ক্ষমতাবান মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দেন না। তিনি বলে পাঠালেন–অপেক্ষা করতে। সে ঘণ্টাখানিক বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে লাগল। মনসুরউদ্দিন সাহেব এই সময় বের হয়ে এলেন এবং কঠিন গলায় বললেন–এই যে ছেলে, তুমি কী মনে করে আমার ফ্লাওয়ার বেডের উপর হাঁটছ? কটা গাছ তুমি নষ্ট করেছ জান? ফ্লাওয়ার বেড কাকে বলে সেটা জান? তুমি কোথাকার মূর্খ?

মনজুর পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল। একী সমস্যা!

কথা বলছি না কেন? তুমি কোথাকার মূর্খ সেটা জানতে চাই।–Speak out loud.

মীরা হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে মনজুরকে বলল, আপনি কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন তো। প্লিজ আসুন। প্লিজ।

মীরা তাকে বারান্দার এক কোণায় নিয়ে নিচু গলায় বলল, বাবার ব্যবহারে আমি খুবই দুঃখিত, খুবই লজ্জিত। বাবার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। বাবাকে প্রথম দেখছেন বলে এ রকম মনে হচ্ছে। আপনাকে বাবা যেভাবে ধমক দিলেন ফুলের গাছগুলোকেও তিনি ঠিক সেইভাবে ধমক দেন। মাঝে মাঝে কিছু কিছু গাছকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আশা করি বাবার মানসিকতা কিছুটা বুঝতে পারছেন। আপনি এখানে চুপ করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি। বাবা যদি কিছু বলেন–কোনো উত্তর দেবেন না। তবে আমার মনে হয় না। তিনি কিছু বলবেন। একবার রেগে যাবার পর ঘণ্টা দু'এক তিনি খুব ভালো থাকেন।

মীরার কথা দেখা গেল সত্যি। কিছুক্ষণ পরই মনসুর উদ্দিন বারান্দায় উঠে এলেন এবং কোমল গলায় মনজুরকে বললেন–আপনাকে তো চিনতে পারলাম না! আপনার পরিচয়? আপনাকে কি চা-নাশতা কিছু দেয়া হয়েছে?

কুদ্দুসের বাসা যাত্রাবাড়িতে।

হাফ বিল্ডিং। পাকা মেঝে, উপরে টিন। বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়ি ঘেরা। বেড়ার আড়াল থেকে কলাগাছের নধর পাতা উকি দিচ্ছে।

মনজুর খানিকটা বিস্ময় নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কুদ্দুসের বাড়ি তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ শ্রীমন্ত চেহারা। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ আসছে না। সব কেমন ঝিম মেরে আছে। তাই অবশ্যি থাকার কথা। মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সবাই বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্যে চুপ করে যায়। আবার কান্নাকাটি শুরু হয় দিন দুএক পর।

মনজুর কড়া নাড়তেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তাঁর গায়ে পাতলা জামা। তবে গলায় মাফলার আছে। পায়ে মোজা। চোখে চশমা। শিক্ষক শিক্ষক চেহারা।

এটা কুদ্দুসের বাসা?

জ্বি।

কুদ্দুস আছে বাসায়?

না।

আমি কুদ্দুসের জন্যে কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম।

আমার কাছে দিতে পারেন। আমি তার পিতা। কত টাকা?

আটশ' টাকা। কবর দিতে মোট কত খরচ হয়েছে?

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, কীসের কবর?

মনজুর হকচাকিয়ে গেল।

সাবিহা নামের একটা মেয়ে মারা গেছে না। এই বাড়িতে?

সাবিহা আমার ছোট মেয়ের নাম। সে মারা গেছে দশ বছর আগে। আপনে কে?

আমি তেমন কেউ না। নাম বললে চিনবেন না।

টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান। আমি দিয়ে দিব।

কুদ্দুসকেই দিতে চাই। আমি অন্য একসময় আসব।

আমার কাছে দিতে না চাইলে অপেক্ষা করেন। কুদ্দুস। দশটার মধ্যে আসে। চা খান। চায়ের অভ্যাস আছে?

আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব।

মনজুর রাস্তায় নেমে এল। তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকশায় উঠে হুড তুলে দিতে হবে। এখন কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। বুকে ঠাণ্ডা বসে না গেলে হয়।

ঘুমাবার আগে আয়নায়

ঘুমাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার যে বাসনা সব তরুণীর মনেই থাকে। সে বাসনা মীরার ভেতর অনুপস্থিত। ওই কাজটি সে কখনো করে না। চুল বঁধে হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময় সে গুনগুন করে গানও গায়। সে কখনো গান শেখে নি, তবে দু একটা সহজ সুর ভালোই তুলতে পারে।

আজ সে আয়নার সামনে বসে আছে।

বিশাল আয়না। এক ইঞ্চি পুরো বেলজিয়াম গ্লাস। সামনে দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। মনসুরউদ্দিন, মেয়ের ষোল নম্বর জন্মদিনে এই আয়না তাকে উপহার দুবলেছিলেন—রোজ এক বার আয়নার সামনে দাঁড়াবি এবং নিজের সঙ্গে কথা বলবি।

মীরা বিস্মিত হয়ে বলেছিল–কী কথা বলব?

নিজেকে প্রশ্ন করবি।

নিজেকে প্রশ্ন করার জন্যে আয়না লাগবে কেন?

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন–তোর সঙ্গে কথা বলাই এক যন্ত্রণা। তুই আমার সামনে থেকে যা।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, জন্মদিনে তুমি আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলছি। এটা কি বাবা ঠিক হচ্ছে? এখনো সময় আছে। ধমক ফিরিয়ে নাও।

ধমক ফিরিয়ে নেব কীভাবে?

মুখে বল ধমক ফিরিয়ে নিলাম–তাহলেই হলো।

তাকে তাই করতে হলো।

মীরা তার জন্মদিনের উপহার এই বিশাল আয়নার সামনে অনেকবার দাঁড়িয়েছে কিন্তু কখনো নিজেকে প্রশ্ন করে নি। আয়নার ছবিকে প্রশ্ন করার পুরো ব্যাপারটা তার কাছে সব সময়ই হাস্যকর মনে হয়েছে। আজ অবশ্যি সে একটা প্রশ্ন করল। নিজের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মীরা দেবী, আপনি কেমন আছেন?

আয়নার মীরা দেবী সেই প্রশ্নের উত্তরে হেসে ফেলে বলল, ভালোই।

ভালোর পর ইকার লাগাচ্ছেন কেন? তার মানে কি এই যে আপনি বিশেষ ভালো নেই।

আচ্ছা ইকার তুলে দিলাম। আমি ভালো আছি।

খুব ভালো?

হ্যাঁ খুব ভালো।

খুব ভালো থাকলে গান গাচ্ছেন না কেন? আপনার মন খুব ভালো থাকলে আপনি উল্টাপাল্টা সুরে গান গেয়ে থাকেন। দেখি এখন একটা গান তো।

মীরা গুনগুন করে গাইল–

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।

গান দুলাইনের বেশি এগুলো না। কাজের মেয়ে এসে বলল, বড় সাে‍ব আপনেরে যাইতে বলছে। মীরা গান বন্ধ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েকদিন থেকেই এই ভয় সে করছিল। না জানি কখন বাবা তাকে ডেকে পাঠান। সে চব্বিশ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। এই চবিবশ দিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি। মনে হচ্ছে আজ হবে। বাবার মাথা এখন ঠিক আছে। লজিক পরিষ্কার। তবে শুধু একদিকের লজিক। এক-চক্ষু হরিণের মতো। সমস্যাটা এইখানে।

বাবা ডেকেছ?

মনসুরউদ্দিন সাহেবের ঘরের বাতি নেভানো। জিরো পাওয়ারের নীল একটা বাল্ব জ্বলছে। সে আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি মশারির ভিতর কম্বল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তিনি খাটের পাশে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মীরা বোস।

মীরা বসতে বসতে বলল, রাত এগারটা বাজে। তোমার তো দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, এখনো জেগে আছ যে! ডাক্তার শুনলে খুব রাগ করবে।

শুয়ে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।

ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?

হুঁ।

এখন কতটুকু করে খাও? ফ্রিজিয়াম ফাইভ মিলিগ্রাম না। দশ মিলিগ্রাম?

দশ।

মীরা আর কী বলবে ভেবে পেল না। সে নিজের ভেতর চাপা উদ্বেগ অনুভব করছে। মনসুরউদ্দিন বললেন— মীরা, তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?

না।

বলতে চাইলে আমি শুনতে রাজি আছি। ভালো না লাগলেও শুনব।

আমার কিছু বলার নেই বাবা। তুমি ঘুমাও।

বাইরের কিছু কথাবার্তা আমার কানে আসছে–শুনলাম মনজুরকে ছেড়ে তুই চলে এসেছিস ; সত্যি না মিথ্যা?

সত্যি।

কারণ কী?

ওকে আমার আর পছন্দ হচ্ছিল না।

পছন্দ না হবারই কথা–গোড়াতেই তো বোঝা উচিত ছিল।

তখন বুঝতে পারি নি।

অপছন্দটা হচ্ছে কেন?

অনেক কারণেই হচ্ছে। স্পেসিফিকেলি বলার মতো কিছু না। ছোটখাটাে ব্যাপার।

ছোটখাটাে ব্যাপারগুলোই আমি শুনতে চাই ...।

মীরা চুপ করে রইল। সব কথা কি বাবার কাছে বলা যায়? বাবা কেন এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, কথা বলছিস না কেন? কী করে সে—হাঁ করে ঘুমায়? নাক ডাকে? শব্দ করে চা খায়? সবার সামনে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ে?

মীরা হোসে ফেলল।

মনসুরউদ্দিন কড়া গলায় বললেন, হাসির কোনো ব্যাপার না। তুই পছন্দ করে আগ্রহ করে সবার মতামত অগ্রাহ্য করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিস, এখন তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস-কী কারণে চলে এসেছিস তাও বলতে পারছিস না। অপছন্দ? কেন অপছন্দ?

মনের মিল হচ্ছে না বাবা।

মনের মিলের সময় কি শেষ হয়ে গেছে? একটা মানুষকে বুঝতে সময় লাগে না? সেই সময় তুই দিয়েছিস?

হ্যাঁ দিয়েছি। তিন বছর অনেক সময়। বাবা শোন, সবকিছু তো আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি করি নি। তার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে থাকতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। সে ভালোবাসতে জানে না। সে খানিকটা রোবটের মতো।

আর তুই ভালোবাসার সমুদ্র নিয়ে বসে আছিস?

এমন করে কথা বলছি কেন বাবা?

কী অদ্ভুত কথা–ভালোবাসতে জানে না! দিনের মধ্যে সে যদি একশবার বলে, ভালোবাসি ভালোবাসি তাহলে ভালোবাসা হয়ে গেল? আমি তোর মার সঙ্গে বাইশ বছর কাটিয়েছি। এই বাইশ বছরে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' জাতীয় ন্যাকামি কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।

মুখে না বললেও মনে মনে বলেছ। লক্ষবার বলেছ–মনজুরের মুখে এই কথা নেই, মনেও নেই।

তুই মনের কথাও বুঝে ফেললি? তুই এখন তাহলে মনবিশারদ?

মনের কথা খুব সহজেই বোঝা যায় বাবা। যে মানুষটা আমাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসার ক্ষমতাই যার নেই তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি কাটাব কী করে?

ভালোবাসার ক্ষমতাই তার নেই?

না। এই যে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি–তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না বা মন খারাপ হচ্ছে না। সে বেশ খাচ্ছেদচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, অফিস করছে। আমি যদি এখন ফিরেও যাই।–তার জীবনযাপন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে খুশিও হবে না, অখুশিও হবে না।

মনসুরউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই ফিরে যাবি না–এরকম কোনো মতলব করেছিস নাকি?

হ্যাঁ করছি। তুই আমার সামনে থেকে যা। ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোকে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া উচিত হবে না। সবচে' ভালো হয় যদি এখন চলে যাস। ড্রাইভার তোকে জালালের বাসায় দিয়ে আসুক। ভাইয়ের সঙ্গে থাকেআমার সঙ্গে না। যাদের দেখলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। তাদের আমি আমার আশপাশে দেখতে চাই না।

তুমি অকারণে এতটা রাগছ।

মনসুরউদ্দিন ঘর কঁপিয়ে হুঙ্কার দিলেন, গেট আউট! গেট আউট!

মীরা বের হয়ে এল। রাতে কোথাও গেল না। ভোরবেলা জালালউদিনের বাড়িতে উপস্থিত হলো। এই বাড়িতে একটি ঘর সব সময় তার জন্যে আছে। ঘরের নাম 'মীরা মহল'।

মীরা তার ভাই এবং ভবির খুব ভক্ত। তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মীরা অনেকটাই তাদের সন্তানের মতো।

সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমেই ভাবির সঙ্গে দেখা হলো। মীরা বলল, কেমন আছে ভাবি? আমি মীরা মহলে কিছুদিন থাকতে এসেছি। মীরা মহলের চাবি তোমার কাছে না ভাইয়ার কাছে?

খবরের কাগজে লিখেছে শৈত্যপ্রবাহ

খবরের কাগজে লিখেছে 'শৈত্যপ্রবাহ'

'শৈত্যপ্রবাহ' মানে যে ঠাণ্ডা কে জানত?

মীরা ফুলহাতা সুয়েটার পরেছে। সুয়েটারের উপর গরম শাল–তবু শীত যাচ্ছে না। আজ বারান্দায় রোদও আসে নি। আকাশ শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের মতো। সবকিছু যেন ঝিম ধরে আছে।

মীরার বড় ভাই জালালউদ্দিন বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছেন। তাঁর বয়স পয়তাল্লিশ। এই বয়সেই চুলটুল পাকিয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়োদের মতো অমাবস্যাপূর্ণিমাতে বাতে কষ্ট পান। এইসব দিনে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করতে থাকে। আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কোনোটাই না, তবু তাঁর পিঠে ব্যথা উঠেছে। ব্যথার কারণে বাইরে বের হননি। ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা। পচিশ মিনিট পার হয়েছে–ডাক্তার এখনো আসে নি।

জালালউদিনের পায়ের কাছে কম্বল ভাজ করে বিছানো। তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর কম্বলে এসে চিৎ হয়ে শুচ্ছেন। ব্যথার তাতে কোনো হেরফের হচ্ছে না। তার মেজাজ অসম্ভব খারাপ। যাকেই দেখছেন তাকেই ধমক দিচ্ছেন। মীরা এর মধ্যে দুবার ধমক খেয়েছে। তৃতীয়বার ধমক খাওয়ার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে আছে। ভাইয়ার কাছে বকা খেতে তার তেমন খারাপ লাগে না।

মীরা শোন তো–হট ওয়াটার ব্যাগে পানি ভরে দিতে বলেছি চল্লিশ মিনিট আগে। পানি গরম করতে চল্লিশ মিনিট লাগে?

মীরা সহজ গলায় বলল, পানি গরম হয়ে গেছে। হট ওয়াটার ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রাইভার গেছে আরেকটা কিনে আনতে।

এখন একটা কিনতে গেছে? আগেরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? এই বাড়ির সব ক'টা মানুষ ইডিয়ট নাকি?

শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি করছি কেন?

দরকারের সময় একটা জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না–তাহলে বাড়িতে এতগুলো মানুষ থাকার প্রয়োজন কী?

চুপ করে শুয়ে থাকে তো ভাইয়া। আমি বরং পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।

খবরদার–পিঠে হাত দিবি না। অসহ্য ব্যথা।

কাত হয় শুয়ে দেখ তো আরাম হয় কিনা।

তোর উপদেশ দেবার দরকার নেই। তুই ডাক্তার না।

মীরাকে এই কথা বললেও তিনি কান্ত হয়ে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল।

ভাইয়া ব্যথা কমেছে?

একটু কম লাগছে।

তাহলে এইভাবে শুয়ে থাক।

কাত হয়ে কতক্ষণ শুয়ে থাকিব? তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস কেন?

ব্যথা তো কমেছে। তবু এমন চোঁচামেচি করছ কেন? চা খাবে, চা দিতে বলব?

কাত হয়ে চা খাব?

মীরা হেসে ফেলল।

মীরার হাসি দেখে জালালউদ্দিন নিজেও হেসে ফেললেন। যদিও খুব ভালো করে জানেন এখন হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। রাগ ভাবটা ধরে রাখা উচিত।

মীরাকে কিছু কঠিন কথা বলা প্রয়োজন। সমস্যা হলো পিঠের ব্যথা কমার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মীরা।

বলো কী বলবে।

তোর ভাবি বলছিল তুই নাকি আলাদা বাসা ভাড়া করার কথা চিন্তা করছিস?

ঠিকই বলেছে। ভাবির স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। সে পুরো কনভারসেসন, দাঁড়িকমাসহ রিপ্রডিউস করতে পারে। তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ।।

এখানে অসুবিধাটা কী?

কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এখানে আমি মহা সুখে আছি। এক হাজার করে টাকা হাত খরচও পাচ্ছি।

এই এক হাজার টাকা দিয়ে তুই বাসা ভাড়া করে থাকবি?

আমার নিজের কাছে কিছু টাকা আছে। চার পাঁচ মাস ঐ টাকায় চালাব, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি কিছু একটা জোগাড় করে নেব।

চাকরি নিয়ে সবাই তোমার জন্যে বসে আছে?

ভাইয়া শোন, ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি আমার আছে। অনেকের সঙ্গে চেনাজানা আছে। আমার পক্ষে একটা চাকুরি জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। তুমি নিজেও এটা ভালো জান। তা ছাড়া একজন রূপবতী ডিভোর্সিকে সাহায্য করার জন্যে সবাই খুব উৎসাহ বোধ করে।

জালালউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মেয়েটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী ধরনের কথাবার্তা? পিঠের ব্যথা চলেই গিয়েছিল–উল্টাপাল্টা কথার কারণেই বোধহয় ফিরে আসছে।

তুই নিজেকে বেশি চালাক মনে করিস?

মীরা সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ করি। এতে কোনো দোষ নেই। বোকারা নিজেদের চালাক মনে করলে দোষ। বুদ্ধিমানরা মনে করলে দোষ নেই।

বুদ্ধির দোকান খুলে বসেছিস মনে হয়।

রেগে যাচ্ছে কেন? আবার ব্যথা শুরু হয়েছে? এখন চিৎ হয়ে শুয়ে দেখা। এখন চিৎ হয়ে ঘুমালে হয়তো ব্যথা করবে না।

জালালউদ্দিন নিজের অজান্তেই চিৎ হয়ে শুলেন। না, ব্যথা লাগছে না। তাঁর গলার স্বর থেকে রাগ ভাবটা এই কারণেই অনেকখানি কমে গেল। তবু কঠিন গলায় কথা বলার চেষ্টা করলেন, তোর কি ধারণা, ফড়ফড় করে কথা বলা বুদ্ধিমানের লক্ষণ?

না, এটা বোকার লক্ষণ। বোকারাই ফড়িফড় করে কথা বলে। বুদ্ধিমান লোকদের লক্ষ করলে দেখবে এরা কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করে অপেক্ষা করে। আবার কথা বলে, তারপর আবার অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টায় তারা চিন্তা করে। অতি দ্রুত চিন্তা করে।

আমার সম্পর্কে তোর কী ধারণা? আমি বোকা, না বুদ্ধিমান?

তুমি বোকাও না, বুদ্ধিমানও না–মাঝামাঝি।

তোর নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি।

হুঁ।

এই বুদ্ধির জন্যে তোর জীবনটা কোথায় এসে থেমেছে এটা দেখেছিস ; হাতের কাছে এতগুলো ছেলে থাকতে বিয়ে করলি একটা অগা-বগাকে।

তা করেছি। তবে–সে অগা-বগা। কিন্তু না। তাকে আমার পছন্দ হয় নি। ভবিষ্যতেও যে হবে না এটা বুঝতে পেরেছি এবং খুব সম্মানজনকভাবে আলাদা হবার ব্যবস্থা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।

তুই আমার সামনে থেকে যা।

যাচ্ছি।

যাবার আগে একটা টেলিফোন করে দেখ–ডাক্তারের কী হয়েছে?

ভাইয়া, আমার মনে হয় তুমি যদি একটা হট শাওয়ার নাও তাহলে আরাম হবে।

হট শাওয়ারের চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে শুনে তারপর করতে চাই। তোর ডাক্তারি তুই তোর নিজের জন্যে রেখে দে।

ডাক্তারকে টেলিফোন করার দরকার পড়ল না। গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

মীরা মনজুরের অফিসে টেলিফোন করল। আজ মঙ্গলবার। বুধবারের কথা মনে করিয়ে দেয়া দরকার।

‘হ্যালো’ বলতেই মনজুরের গলা শোনা গেল–মনজুর ভারি গলায় বলল, কে বলছেন?

আমি, আমি মীরা।

ও আচ্ছা মীরা। কেমন আছ?

ভালো আছি। আমি হ্যালো বললাম তারপরেও আমাকে চিনতে পারলে না!

চিনিব না কেন, চিনেছি।

চিনেছ তা হলে বললে কেন–কে বলছেন?

অভ্যাস। হ্যালো বলতেই–‘কে বলছেন’? বলি তো...

থাক এক এক্সপ্লানেশনের দরকার নেই। তাোমাকে খুব জরুরি কারণে টেলিফোন করেছি।

মনজুর উদ্বিগ্ন গলায় বলল, জরুরি কারণটা কী?

তুমি আন্দাজ কর তো।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আজ মঙ্গলবার। তোমাকে বুধবারে আসতে বলেছিলাম।

ও আচ্ছা–মনে আছে। আমি এপয়েন্টমেন্ট বইয়ে লিখে রেখেছি।

তোমার আবার এপয়েন্টমেন্ট বুক আছে নাকি?

ঠিক এপয়েন্টমেন্ট বুক না— ডেস্ক ক্যালেন্ডার। কাল সকালে পাতা উল্টাবে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

দয়া করে এখনি উল্টাও। ডেস্ক ক্যালেণ্ডারের পাতা তুমি কখনো উল্টাও না।

আচ্ছা উল্টালাম।

কী লেখা পড়ে শোনাও তো। যা লেখা হুবহু তাই তুমি পড়বে।

বেশি কিছু না–শুধু মীরা লিখে রেখেছি। নাম দেখলেই মনে পড়বে।

আমি টেলিফোন করার আগে কী করছিলে?

ডিভানে শুয়ে ছিলাম।

শুয়ে ছিলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

একটু খারাপ। কিডনি বিষয়ক জটিলতা।

পরিষ্কার করে বল। কিডনি বিষয়ক জটিলতা মানে?

সবে ধন নীলমণি যেটা আছে সেটা নন-কোঅপারেশন করছে।

এটা কি তোমার নিজের ধারণা না ডাক্তাদের ধারণা?

ডাক্তারদের।

ভালোমতো চিকিৎসা করাও।

করাচ্ছি!

আচ্ছা। তাহলে বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আচ্ছা। তুমি ভালো তো?

ভালো।

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মনজুরের সঙ্গে কথা বলার পর তার কিছুক্ষণের জন্যে খারাপ লাগে। লজ্জা এবং অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি হয়। নিজের উপর তার খানিকটা রাগও লাগে। শেষের দিকে মনজুরের সঙ্গে সে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। এতটা খারাপ ব্যবহার মনজুরের প্রাপ্য ছিল না। তার চরিত্রে কিছু ইন্টারেস্টিং দিক অবশ্যই আছে :

যেমন–সে ভালোমানুষ। অসাধারণ কিছু না, সাধারণ ভালো মানুষদের একজন। শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন মানুষ এই পর্যায়ের।

আজ বুধবার।

জামান সাহেব এসে পড়েছেন। জালালউদিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে মাথা দুলিয়ে গল্প করছেন। বিলেতের গল্প। বিলেতে ক্রিসমাসের সময়ে এক তরুণীকে রাস্তা পার করাতে গিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প।

বুঝলেন জালাল সাহেব, পকেট থেকে সিক্সটি পাউন্ড খসে গেল। আজ থেকে পনের বছর আগের ঘটনা। পনের বছর আগের সিক্সটি পাউন্ড মানে সিক্সটি ইনটু ফিফটিন অর্থাৎ প্রায় নয় শ পাউন্ড।

জালালউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। মীরার হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাওয়ার মতো কোনো গল্প না। মাঝে মাঝে লোকজনদের অকারণেই হাসতে ইচ্ছা করে; তখন একটা উপলক্ষ ধরে হাসে। এখানেও তাই হচ্ছে।

জামান সাহেব মীরার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের ক্লায়েন্ট তো এখনো আসছে না।
মীরা বলল, এসে পড়বে।

আমার অবশ্য কোনো তাড়া নেই। আরেক প্রস্থ চা হােক।

জালালউদ্দিন বললেন, অন্য কোনো পানীয় খাবেন? ভালো স্কচ আছে।

ঝামেলা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে। স্কচের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আটলান্টিক সিটিতে একবার কী হয়েছিল শুনুন। একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছি–এলাদিনস ক্যাসেল। ওখানকার খাবারটা সস্তা এবং ভালো। ভাবলাম খেতে খেতে একটা শো দেখে ফেলি। একটা ড্রিংকস নিয়ে বসেছি— অমনি প্রসটিটিউট ধরনের এক তরুণী বলল, বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, তুমি কি আমাকে একটা ড্রিংক অফার করবে? আমি বললাম, অবশ্যই। তুমি ওয়েটারকে বল কী খেতে চাও।

মেয়েটা নিচু গলায় ওয়েটারকে কী যেন বলল, সে তৎক্ষণাৎ একটা গ্লাস এবং বোতল এনে টেবিলে রাখল। মেয়েটা অতি দ্রুত বোতল শেষ করে আমাকে থ্যাংক দিয়ে চলে গেল। বিল দিতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দুশ চল্লিশ ডলার! মেয়েটা নাকি দুশ ডলার দামের ফরাসি শ্যাম্পেন চেয়েছিল। তাকে তাই দেয়া হয়েছে। হা-হা-হা।

জালালউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মীরা ভেবে পেল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে। সব মানুষ এত বা েকা কেন? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এত অল্প!

কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে।

মীরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চাদর গায়ে মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কালো। একটা ব্যাগ। তার চাদর ভেজা-ভেজা। মীরা বলল, বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

হুঁ। এইবারের শীতকালটা অদ্ভুত–দুদিন পরপর বৃষ্টি। আমি কি দেরি করে ফেললাম?

হ্যাঁ দেরি করেছ।

জামান সাহেব এসেছেন?

দুঘণ্টা আগে এসেছেন।

সরি, ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। ক্লিপে লেখা এগার। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, আসলে লেখা উনিশ।

ডাক্তার কী বলল?

বলে নি কিছু। টেস্ট-ফেস্ট করতে দিয়েছে।

এস আমার সঙ্গে। তাঁরা বারান্দায় বসেছেন। তোমার ব্যাগে কী?

কিছু না। ব্যাগটা এখানে রেখে যাই?

সঙ্গে থাক। অসুবিধা কিছু নেই। চাদর খুলে ফেল। ভেজা চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখার মানে কী? দাও আমার কাছে দাও।

জামান সাহেব মনজুরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুর বিনীত ভঙ্গিতে বলল, সরি আপনাদের দেরি করিয়ে দিয়েছি।

জামান সাহেব কিছু বললেন না। মনজুরকে তাঁর চেনা চেনা মনে হচ্ছে–কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। তিনি ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে কি আমি আগে দেখেছি? বা আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভালো না।

আমার যথেষ্টই ভালো; কিন্তু আমিও মনে করতে পারছি না। যদিও খুব চেনা চেনা লাগছে।

জালালউদ্দিন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি। তিনি বললেন, কাজের কথা শুরু করলে কেমন হয়? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

জামান সাহেব বললেন, কাজের কথা আর কী? দুজনের পুরোপুরি সম্মতিতেই ব্যাপারটা ঘটছে। আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে এনেছি। কয়েকটা সই হলেই হবে। মনজুর সাহেব। আপনি বরং ডকুমেন্টগুলো পড়ুন।

মনজুর নরম গলায় বলল, পড়তে হবে না। কোথায় সই করব বলুন।

দেখুন ক্রস দেয়া আছে। সই করবার সময় পুরো নাম লিখবেন।

জ্বি আচ্ছা।

একবার আপনাকে কোর্টেও আসতে হবে। পারবেন না?

পারব। কবে?

সোমবার ঠিক এগারটায়। আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। এই কার্ডটা রাখুন। এখানে ঠিকানা দেয়া আছে।

মনজুর হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মীরা এল তার পেছনে পেছনে। তবে সে কিছু বলল না। এই প্রথম ঘর থেকে বেরুবার সময় সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল না।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চাদরটা ফেলে আসায় মাথা ভিজে যাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি না হলে হয়।

উড কিং-এর মালিক বদরুল আলম

‘উড কিং’-এর মালিক বদরুল আলম, মনজুরের মেজো মামা। ‘উড কিং’ ছাড়াও ঢাকা শহরে তাঁর আরো দুটি ফার্নিচারের দোকান আছে। মূল কারখানা মালিবাগে। কারখানার সঙ্গে তার হেড অফিস।

এই মুহূর্তে তিনি মালিবাগের হেড অফিসে বসে আছেন। চায়ের কাপে মুড়ি ভিজিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে কারখানার ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার হাতে গোটা দশেক রসিদ। একটু দূরে কান ধরে ‘উড কিং ফার্নিচারের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী নসু। মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এগার। সে এক টিন তার্পিন তেল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বদরুল আলম চা-পর্ব শেষ করেইনসুর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নসুকে আসন্ন শাস্তির আশঙ্কাতে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না।

বদরুল আলমের বয়স একষট্টি। শক্ত-সমর্থ চেহারার বেঁটেখাটাে মানুষ। তিনি ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না। কিছুদিন হলো আলসার ধরা পড়েছে। আলসারের চিকিৎসা হিসাবে সারাক্ষণ কিছু না কিছু খাচ্ছেন। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়া সেই চিকিৎসারই অঙ্গ।

মনজুর ঘরে ঢুকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসল। বদরুল আলম সেই হাসির দিকে কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। এটাও তাঁর স্বভাবের অংশ। যে-কোনো আগন্তুককে প্রথমে কিছুক্ষণ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ভাব করেন যেন দেখতে পান নি।

মনজুর পাশের চেয়ারে বসল। মামার দৃষ্টি আকর্ষণের কোনাে চেষ্টা করল না। কারণ সে জানে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার, নসুর শাস্তির ব্যাপারটা শেষ করে দেন।

,

বদরুল আলম কড়া গলায় বললেন, শেষ করাকরি আবার কী? তার্পিন তেলের টিনটা উদ্ধার হয়েছে?

জ্বি স্যার।

তাহলে ঐ টিন থেকে বড় চামচে দুই চামচ তেল খাইয়ে দাও। এটাই ওর শাস্তি।

শাস্তির এই ব্যবস্থায় নসুকে খুব আনন্দিত মনে হলো। সে ফিক করে হেসেও ফেলল। ইয়াসিন মোল্লাকে দেখে মনে হচ্ছে শাস্তির এই ধারাটি তার পছন্দ না। সে বিরস গলায় বলল, স্যার রসিদগুলো একটু দেখবেন? দুই হাজার সিএফটি কাঠ ...

বদরুল আলম। শুকনো গলায় বললেন, সব কিছু যদি আমি দেখি তাহলে আপনি আছেন কী জন্যে? এখন যান। নসুকে নিয়ে যান। শাস্তি দেন।

তেল সত্যি সত্যি খাওয়াব?

অবশ্যই খাওয়াবেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান।

ঘর খালি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল আলম বললেন, আমার এই ম্যানেজার বিরাট চোর। থিফ নাম্বার ওয়ান।

মনজুর বলল, থিফ নাম্বার ওয়ান হলে বিদায় করে দেন না কেন? চোর পোষার দরকার কী?

দরকার আছে। পোষা চোর কী করে চুরি করে সেই কায়দা-কানুন জানা থাকে। ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করামাত্র ধরে ফেলি। নতুন একজনকে নিলে তার চুরির কায়দাকানুন ধরতে ধরতে এক বৎসর চলে যাবে। এক বৎসরে সে দোকান ফাঁক করে দেবে, বুঝলি?

হ্যাঁ বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। ম্যানেজার রসিদগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করছে। কেন করছে? কারণ চুরি আছে। ওর মধ্যে। বিরাট ঘাপলা। আমি তাকে কী বললাম? বললাম–আমি কিছু দেখতে পারব না–সে নিজে যেন দেখে। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে চুরি করবে। আগের মতো সাবধান থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে, ক্যাঁক করে ঘাড় চেপে ধারব। বুঝলি?

বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। আমার কাছে কী ব্যাপার?

তোমাকে দেখতে এলাম।

ঠাট্টা করছিস নাকি?

ঠাট্টা করব কেন? মাসে এক বার তোমাকে দেখতে আসি না?

বদরুল আলম চাোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মনজুর সত্যি কথাই বলছে। সে মাসে একবার আসে। প্রতি মাসের শেষের দিকে। ঘণ্টা খানেক থাকে।

কেন আসিস আমার কাছে?

তোমাকে দেখতে আসি।

কেন?

কী যন্ত্রণা, এত জেরা করছি কেন?

বদরুল আলম চোখ থেকে চশমা খুলে খানিকক্ষণ মনজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চশমা খুলে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। তবু কাউকে বিশেষভাবে দেখার প্রয়োজন হলে চশমা খুলে ফেলেন।

তোর কি শরীর খারাপ নাকি?

হুঁ।

সমস্যা কী?

শরীরের রক্ত ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না।

কালোজাম খা। কালোজামে রক্ত পরিষ্কার হয়।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, শীতকালে কালোজাম পাব কোথায়? তাছাড়া কালোজামের স্টেজ পার হয়ে গেছে। কিডনি যেটা ছিল সেটাও যাই-যাই করছে।

কী বলছিস তুই!

সত্যি। আমি এখন কিডনির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইয়ারকি করছিস নাকি?

ইয়ারকি করছি না। দুজন বড় ডাক্তার তাই বললেন।

বড় ডাক্তাররা কিছুই জানে না। ছাােট ডাক্তারদের কাছে যা।

ছোট ডাক্তারদের কাছে যাব?

হ্যাঁ। ওরা যত্ন করা দেখবে। এই পাড়ায় একজন এল.এম.এফ ডাক্তার আছে। ভূপতি বাবু ভালাে। তার কাছে যাবি? 'আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে খুব ভালাে খাতির।

না।

ছোট বলে অবহেলা করিস না। ছোট কাঁচামরিচের ঝাল বেশি।

ঝাল পচা আদারও বেশি। তাই বলে পচা অাদা কোনো কাজের জিনিস না।

বদরুল আলম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন, পচা আদার কোনো ব্যবহার মনে পড়ে কিনা। মনে পড়ল না।

তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি মামা।

টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার না হলে বল। টাকা-পয়সা ছাড়া সব পাবি।

টাকা-পয়সা কি তোমার নেই?

আছে। দেয়া যাবে না। টাকা ব্যবসায় খাটে। ব্যাংকে ফেলে রাখি না।

ব্যাংকে কিছু তো আছে?

তা আছে।

সেখান থেকে এক লাখ দেয়া যাবে?

এত লাগবে কেন?

কিডনি কিনতে হবে। লাখ খানিক টাকা লাগবে কিনতে। অপারেশন করাতে দেশের বাইরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে দরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা।

বদরুল আলম টেবিলে রাখা চশমা চোখে পরলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, তুই কি জনে জনে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিস?

হ্যাঁ।

কোনো লাভ নাই–অন্য পথ ধর।

অন্য কী পথ ধরব?

তা আমি কী বলব। ভেবে-চিন্তে বার করা। তুই গরিব মানুষ, বাঁধাবি গরিবের অসুখ–দাস্ত, খোস-পাঁচড়া, হাম, জলবসন্ত, তা না... চা খাবি?

না।

খা। চা খা। ফ্রেশ মুড়ি আছে, খেজুর গুড় দিয়ে খা।

মনজুর উঠে দাঁড়াল।

বদরুল আলম বললেন, তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি? রাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক না। তুই ঝগড়া করি আমার সঙ্গে। চিৎকার, চেঁচামেচি করা। তাহলে তোর মনটা হালকা হবে। তুই রোগী মানুষ, মনটা হালকা থাকা দরকার।

আমার মন হালকাই আছে।

আরে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

বোস বোস। চা খেয়ে তারপর যা। সিগারেটখোররা বিনা সিগারেটে চা খেতে পারে না। এই জন্যে মুরুব্বিদের সামনে তারা চা খায় না। যা, তোকে সিগারেটের অনুমতি দিলাম। এখন চা খাবি তো? নাকি এখনো না!

মনজুর বসল।

বদরুল আলম গলার স্বর নিচু করে বললেন, মনটা খুবই খারাপ। তোর অসুখবিসুখের জন্যে না। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের জীবনে আছেই। এই দেখ না বুড়ো বয়সে আমার হয়ে গেল আলসার।

মন খারাপ কী জন্যে?

আমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে মনটা খারাপ। তারা এখন লায়েক হয়ে গেছে। সমাজে পজিশন হয়েছে। আমি যে একজন কাঠমিস্ত্রি এই জন্যে তারা লজ্জিত। আমাকে লোকজনের সামনে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় জানিস? বলে–ইনি আমার ফাদার। ব্যবসা করেন। টিম্বর মার্চেন্ট। আমি তখন কী করি জানিস? আমি গভীর হয়ে বলি–না রে ভাই। আমি কোনো টিম্বার মার্চেন্ট না। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি।

তুমি তো সত্যি কাঠমিস্ত্রি না।

না তোকে বলল কে? কাঠের কাজ আমি করি না? এখনো করি।

চা এসে গেছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়েছে। বদরুল আলম খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা একটু আগে এসে বলে গেছে–নস মিয়ার শাস্তি দেয়া হয়েছে। তার্পিন তেল খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন বমি করছে। বদরুল আলম বলেছেন–করুক। তুমি ফট করে ঘরে ঢুকবে না। কথা বলছি। এর মধ্যে একবার টেলিফোন এসেছে। বদরুল আলম রিসিভার তুলে রেখেছেন। এখন তাঁর টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে ভালো লাগছে। ছেলেটা ভালো। কোনো কথা বললে মন দিয়ে শোনে–দশজনের কাছে গিয়ে বলে না।

মনজুর।

জ্বি।

আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের কাণ্ডকারখানা শুনিবি?

বল।

বিয়ে করার পর মনে করছে–আহা কী করলাম। রাজকন্যা পেয়ে গেলাম। চোখেমুখে সব সময় 'সখী ধর ধর' ভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কী মধুর হাসি। এখন কথা বলে শান্তিনিকেতনী ভাষায়–এলুম, গেলুম এইসব। ব্যাটা রবিঠাকুর হয়ে গেছে!

অসুবিধা কী?

অসুবিধা আছে। সবটা না শুনলে বুঝবি না।— গত বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় এসে দেখি মতিন নেইল কাটার দিয়ে তার বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। আমি না-দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে গেলাম। তোর মামিকে বললাম— এই কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। লাথি দিয়ে একে ঘর থেকে বের করে দাও। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম।

নখ কাটা এমন কী অপরাধ?

বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দেয়া অপরাধ না? তুই কখনো বৌমার পায়ের নখ কেটে দিয়েছিস?

না।

তাহলে?

আমি কি আদর্শ মানব? আমি যা করব সেটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক না?

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, তুই আদর্শ মানব হবি কেন? তুই হচ্ছিাস গাধা-মানব। এখন কথা হলো, গাধা-মানব হয়ে তুই যে কাজটা করছিস না সেই কাজটা আমার কুলাঙ্গার করছে–বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। তাও কোনো রাখঢাক নেই। বারান্দায় বসে কাটছে। হারামজাদা।

মতিনের বৌকে তো তুমি পছন্দ করা। কর না?

অবশ্যই করি। ও ভালো মেয়ে। ভেরি গুড গার্ল। আমার কুলাঙ্গারটা মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। একদিন কী হবে জানিস? এই মেয়ে নেইল কাটার নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে, বাবা আমার পায়ের নখগুলি একটু কেটে দিন তো।

মনজুর হেসে ফেলল। বদরুল আলম রাগী গলায় বললেন, হাসছিস কেন? হাসবি না। হাসি-তামাশা এখন আমার সহ্য হয় না। হাসি শুনলেই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়।

উঠি মামা?

আচ্ছা যা। কোনো চিন্তা করিস না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। গড অলমাইটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

মনজুর রাস্তায় এসেই রিকশা নিয়ে নিল। আগে হাঁটতে ভালো লাগত। এখন আর লাগে না। কয়েক পা এগোলেই ক্লান্তিতে হাত-পা এলিয়ে আসে। কয়েকবার সে রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ যে রকম ক্লান্ত লাগছে তাতে মনে হয়–রিকশায় উঠা মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন সাব?

মনজুর কিছু বলল না। কোথায় যাবে এখনো সে ঠিক করে নি। অফিসে যাওয়া যেত কিন্তু আজ অফিস বন্ধ। তাদের অফিস হচ্ছে একমাত্র অফিস যা সপ্তাহে দুদিন বন্ধ থাকে–

শুক্রবার এবং রোববার। আফসার সাহেব তার সব কর্মচারীকে বলে দিয়েছেনদুদিন বন্ধ দিচ্ছি। এই কারণে যাতে বাকি পাঁচদিন আপনারা দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং মন দিয়ে করেন।

আজ রোববার।

সব জায়গায় কাজকর্ম হচ্ছে। তাদের অফিস বন্ধ। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা যেত। শরীরের ক্লান্তি তাতে হয়তো খানিকটা কীটত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অফিস যেদিন থাকে সেদিনই শুধু ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অফিস বন্ধের দিন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। আজ যেমন করছে। অবশ্যি যাবার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনে করে গ্রামের দিকে গেলে কেমন হয়? পছন্দ হয় এমন কোনো স্টেশনে নেমে পড়া। বিকেলের দিকে ফিরে আসা।

সাব যাইবেন কই?

সামনে।

রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে।

স্যারের শইল কি খারাপ?

হুঁ।

কী হইছে?

কিডনি নষ্ট–বেশিদিন বাঁচব না।

না বাঁচাই ভালো। বাঁইচ্যা লাভ কী কন? চাউলের কেজি হইল তের টাকা। গরিবের খানা যে আটা হেইডাও এগার টেকা কেজি।

খুবই সত্যি কথা–দেখি তুমি কমলাপুরের দিকে যাও তো।

রেল ইস্টিশন?

হুঁ।

ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনজুর শক্ত করে রিকশার হুড চেপে ধরল। ঘুম হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর মতো। মৃত মানুষের শরীর যেমন শক্ত হয়ে যায়-ঘুমন্ত মানুষদের বেলায়ও তাই হয়। শরীর খানিকটা হলেও শক্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়লেও হুড ধরা থাকবে। ঝাকুনি খেয়ে রিকশা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অক্ষত অবস্থায় কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছানো যেতেও পারে।

অবশ্যি পৌঁছালেও যে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে তা মনে হয় না। ইচ্ছা মরে যাবে। মানুষের কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কিছুদিন ধরে মনজুরের ইচ্ছা করছে অচেনা একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করা; যে তাকে চেনে না। কিন্তু না চিনলেও যে গল্প শুনবে আগ্রহ নিয়ে। প্রয়োজনে আগ্রহ নিয়ে

গল্প শোনার জন্যে কিছু টাকা-পয়সাও দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হলো, কেউ গল্প শুনতে চায় না ; সবাই বলতে চায়। সবার পেটে অসংখ্য গল্প।

মেজো মামার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ থাকলে তিনি মতিনের নতুন কিছু গল্প শুনাতেন। গল্প বলতে পারার আনন্দের জন্যে মেজো মামার মতো মানুষও তাকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

স্যার নামেন। কমলাপুর আসছে।

মনজুরের নামতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরাচ্ছে। বমি-বমি লাগছে। ঝকঝকে রোদ। সেই রোদ এমন কড়া যে চোখে লাগছে। খুবই তীক্ষ্ণ কোনো সুচ দিয়ে রোদের ছবি কেউ যেন চোখের ভেতর আঁকছে।

সাব নামেন।

ভাই শোন, এখানে নামিব না। তুমি আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে চিন্তা করবে না। যা ভাড়া হয় তার সঙ্গে পাঁচ টাকা ধরে দেব বকশিশ।

বাসা কোনহানে?

বলছি–তুমি চালাতে শুরু কর, তারপর বলছি।

টাইট হইয়া বহেন।

বসেছি। টাইট হয়ে বসেছি। তুমি আস্তে চালাও।

রিকশাওয়ালা খুবই ধীরগতিতে রিকশা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে রিকশার প্যাসেঞ্জার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে ভালাে কথা— অজ্ঞান না হয়ে পড়লেই হয়। রিকশাওয়ালা পথের পাশে গজিয়ে-ওঠা একটা চায়ের স্টলের কাছে এনে রিকশা থামাল। প্যাসেঞ্জার খানিকক্ষণ ঘুমাক। এই ফাঁকে সে টেস্ট দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিবে। ভাড়া হিসাবে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যাবে। একটা টাকা চা-টাষ্টের জন্যে খরচ করা যায়। সে চায়ের কাপ নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, এমন সময় হৈহৈ শব্দ উঠল। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার গড়িয়ে রিকশা থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়েও তার ঘুম ভাঙছে না। তার মানে ঘুম নালোকটা হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয় মারা গেছে।

লোকজন লোকটাকে ধরাধরি করে তুলছে। তুলতে থাকুক, এই ফাঁকে সে দ্রুত চা-টা শেষ করতে চায়। চা-টা মজা হয়েছে। দ্রুত চা খেতে গিয়ে রিকশাওয়ালা মুখ পুড়িয়ে ফেলল।

স্যার আপনি কেমন আছেন

স্যার আপনি কেমন আছেন?

মনজুর জবাব দিল না। জবাব না দেয়ার দুটি কারণের একটি হচ্ছে প্রশ্নকর্তার গলার স্বর সে চিনতে পারছে না। অচেনা একজনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় কারণ–কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। তন্দ্রা ভাব। প্রচণ্ড ঘুম আসার আগের অবস্থা। একটা কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে ঘুমাতে পারলে হত। শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর কম্বল দেয়া আছে কি? সম্ভবত আছে। তবে সেই কম্বল খুব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে রাবারের কম্বল।

স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জাহানারা। এখন আপনার শরীর কেমন?

চোখ না মেলেই বলল, শরীর ভালো।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

মনজুর বিরক্ত হচ্ছে। এটা কী ধরনের প্রশ্ন? তাকে চিনতে পারা না-পারায় কী যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। তবে সে চিনতে পারছে। মনজুর তাকাল। না। তাকানোই ভালো ছিল। তীব্র আলো ধক করে চোখে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ভোতা যন্ত্রণা শুরু হলো। ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতে কি স্যালাইন দেয়া হচ্ছে? এটা হাসপাতাল, না ক্লিনিক? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। হাসপাতাল না হওয়ারই কথা।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কেমন আছ জাহানারা?

জ্বি স্যার ভালো।

এটা কি কোনো ক্লিনিক?

জ্বি না–মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।।

ও আচ্ছ।

আপনি যে হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বারটার সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করল অফিসে। আপনার মানিব্যাগে ভিজিটিং কার্ড ছিল। আপনি স্যার পুরো একুশ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন।

ও আচ্ছা।

টেলিফোন ধরেছিলেন চিত্ত বাবু। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমাকে বললেন, জাহানারা, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছে। কী বলছে কিছুই বুঝতেছি। না। তুমি ম্যাসেজটা রেখে দাও তো, আমি তখন ...

জাহানারা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

মনজুর স্বপ্নেও ভাবে নি, এই মেয়ে এত কথা বলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, এই মেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেয়। নিজ থেকে কথা বলে না। এখন মনে হচ্ছে মেইল ট্রেন। দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে। যেসব মানুষ এমনিতে কম কথা বলে তারা ভয় পেলে প্রচুর কথা বলে।

স্যার, আপনার এখন কেমন লাগছে?

ঘুম পাচ্ছে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ডায়ালাইসিস করা হবে। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। এগুলো ডায়ালাইসিস করে সরাবে। তখন ভালো লাগবে।

আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও। আমি খানিকক্ষণ। ঘুমাব।

আমার স্যার এখন যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি। আপনার আত্মীয়াজন কাকে কাকে খবর দিতে হবে, বলুন, আমি খবর দিয়ে দিব।

কাউকে খবর দিতে হবে না।

ভাবি? ভাবিকে খবর দিব না?

দাও–টেলিফোন নাম্বার হলো...

উনার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার আপনার খোজে টেলিফোন করেছিলেন–তখন উনি তাঁর নাম্বার বললেন। আমি আমার নোট বইয়ে উনার নাম্বার লিখে রেখেছি...

মনজুর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে।

এত কথা বলছে কেন এই মেয়ে? কে তাকে এখানে আসতে বলেছে? মনজুর মনে মনে বলল, 'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।' কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছ? কে তোমার বকবকানি শুনতে চাচ্ছে? তুমি দয়া করে বিদেয় হও। আমাকে ঘুমাতে দাও। ঘুম পাচ্ছে।

আরাম করে একটা ঘুম দিতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। এই মেয়ে তা হতে দেবে না। মানুষ ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। অফিসে এই মেয়ে একটা কথাও বলে না। হাসপাতালে দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে। বাসায় সে কী করে?

স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

মনজুর জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। যাতে ঘুমিয়ে পড়ছে মনে করে মেয়েটা তাকে মুক্তি দেয়।

স্যার, এখন ঘুমাবেন না। ডাক্তার সাহেব আসছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমান। আপনাকে কি আরেকটা বালিশ দিতে বলব? এদের বালিশগুলো খুব পাতলা।

ডাক্তার সাহেব বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনজুরের টেম্পারেচার চার্ট দেখছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব রোগা। তাঁকে সরলরেখার মতো লাগছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বেশ গোলগাাল। মনজুরের মনে হলো–নার্সিটিকে ‘o’এর মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তার যদি ইংরেজি এক হয় তাহলে এই দুজনে মিলে হল দশ।... এইসব কী সে ভাবছে? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? ডাক্তার নিচু হয়ে মনজুরের কপালে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, কেমন আছেন?

ভালো।

শরীর কি খুব দুর্বল লাগছে? বমি ভাব আছে?

আছে।

মাথা ঘুরছে?

না–তবে মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আছে?

আছে। আপনাকে গোপনে বলতে চাই। অন্যদের যেতে বলুন।

ডাক্তারকে কিছু বলতে হলো না। সবাই দূরে সরে গেল। মনজুর গলার স্বর নিচু করে বলল, ঐ যে প্রিন্টের শাড়ি-পরা মেয়েটাকে দেখছেন–তাকে যেতে বলুন। সে আমাকে বড় বিরক্ত করছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না।

তাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এটাই কি আপনার গোপন কথা না। আরো কিছু বলবেন?

না, আর কিছু বলব না। আমার অবস্থাটা কী–জানতে পারি?

টেস্ট প্রায় সবই করা হয়েছে। আপনার কিডনি ভালো কাজ করছে না। তবে এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। ডায়ালাইসিস করলেই আরাম বাে্ধ করবেন। ইতিমধ্যে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন কোনো ডোনার পাওয়া যায় কিনা। আপন ভাইবোন হলে ভালো হয়। না পাওয়া গেলে রক্ত-সম্পর্ক আছে এমন কেউ। সন্ধ্যাবেলা ডক্টর ইমতিয়াজ আসবেন। উনি সব বুঝিয়ে বলবেন। আপনি এখন রেস্ট নিন। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। যে-কোনো অসুখেই বিশ্রাম চমৎকার মেডিসিন।

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মনজুর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম যা মানুষকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। কারণ সে ঘুমাচ্ছে অথচ আশপাশের সমস্ত শব্দ শুনছে। পাশের বেডের রোগী কাশছে। এই শব্দও ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। নার্স এসে কাকে যেন ধমকাচ্ছে–সেই ধমকের প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের ঘাণশক্তি কাজ করে না-তার কাজ করছে। ঘর মুছে যখন ফিনাইল দেয়া হলো–সে ঘুমের মধ্যে ফিনাইলের কড়া গন্ধ পেল।

মনজুরের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। বিছানার কাছে দুটি ডাব হাতে কুদ্দুস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। কুদ্দুস অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যারের শরীরটা এখন কেমন?

শরীর ভালো।

দুইডা ডাব আনলাম স্যার। আমার নিজের গাছের ডাব।

বেডের নিচে রেখে দাও।

কেটে দেই স্যার? এখন একটা খান?

এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।

না খেলে তো স্যার শরীরে বলা হবে না।

বল না হলেও কিছু করার নাই। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

ঐ দিনের ঘটনার জন্যে আমি মাফ চাই স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনি মাফ না দিলে...

মাফ না দিলে কী?

কুদ্দুস মাথা চুলকাচ্ছে–কথা পাচ্ছে না। আগে ভালোমতো রিহার্সেল দিয়ে আসে নি। কুদ্দুসের উচিত ছিল কী কথাবার্তা বলবে সব ঠিক করে আসা। তা করে নি। অবশ্যি অনেক সময় ঠিক করে এলেও বলার সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা তার বেলায় অসংখ্যবার ঘটেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা কথা একটাও সে কোনো দিন বলতে পারে নি।

কুদ্দুস তুমি এখন যাও। কথা বলা আমার নিষেধ আছে।

জ্বি আচ্ছা।

অফিসেও সবাইকে বলবে–তারা যেন না। আসে।

আচ্ছা স্যার বলব।

থ্যাংকস। তোমার ডাব আমি এক সময় খাব।

কুদ্দুস মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, স্যার শুনলাম আপনার একটা কিডনি দরকার?

ঠিকই শুনেছ। তুমি কি দিতে চাও?

কুদ্দুস হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

মনজুর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, দিতে চাইলে পরে এ নিয়ে কথা বলব। এখন যাও।

ডাব দুইটা মনে করে খাবেন স্যার।

বললাম তো খাব।

নিজের গাছের ডাব। বাবা নিজ হাতে গাছ পুঁতেছিলেন।

মনজুর মৃদু গলায় বলল, যাত্রাবাড়ির ঐ বাড়ি কি তোমাব নিজের?

জ্বি না, ভাড়া বাড়ি।

কবে এসেছ ঐ বাড়িতে?

দুই বছর আগে। শ্রাবণ মাসে।

দুই বছর আগে পোঁতা গাছে ডাব হয়ে গেল?

কুদ্দুস ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনজুর বড়ই বিরক্ত বোধ করছে। এ ভালোমতো মিথ্যা বলাও শিখে নি। জেরায় টিকতে পারে না। সামান্য বুদ্ধি থাকলে বলত–দেশের বাড়ির ডাব। বাবা দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। তা না বলে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনজুর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। কুদ্দুস ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার আমি যাই?

আচ্ছা যাও।

কুদ্দুস যাই বলেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মনজুর চোখ বন্ধ করেও তা বুঝতে পারছে। অসুখের সময় মানুষের ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়। মনজুর চোখ মেলল কুদ্দুস চলে যাবার পর। প্রথমেই চোখে পড়ল বিছানার পাশের একগাদা ম্যাগাজিন। কয়েকটা কবিতায় বই। কবিতার বইগুলোতে মীরার নাম লেখা। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। অফিসে তার ঘরের শেলফ থেকে নিয়ে এসেছে। জাহানারার হয়তো ধারণা মনজুর কবিতার পোকা। মনে করাই স্বাভাবিক। সে অনেক বার মনজুরের হাতে কবিতার বই দেখেছে। সে জানেও না মনজুর এইসব বই মুখের সামনে ধরে পাতা ওল্টানো ছাড়া কিছুই করে না। দু একবার যে পড়ার চেষ্টা করে নি তা না। চেষ্টা করেছে–ভালো লাগে নি।

ডান হাতে এখনো স্যালাইনের সুচ বিঁধে আছে। মনজুর বাঁ হাতে একটা কবিতার বই টেনে নিল।

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখে নি, কেউ টের পায় নি
প্রবল ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মনজুর খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তার নিজের সঙ্গে কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মীরাকে নিয়ে সে-কক্সবাজার গিয়েছিল। সমুদ্রের মতো এত সুন্দর জিনিস। অথচ সে

কিনা। থুতু ফেলল সমুদ্রে। মীরা ভ্রু কুঁচকে বলল, আশ্চর্য! তুমি সমুদ্রে থুতু ফেললে। ছিঃ! সে নিজেও হকচকিয়ে গেল। মীরা বলল, এত বিশাল একটা জিনিসের গায়ে তুমি থুতু ফেলতে পারলে?

মনজুর হালকা গলায় বলল, সমুদ্র তো আমাদের দেবতা না মীরা। ওর গায়ে থুতু ফেললে কিছু যায় আসে না।

অবশ্যই সমুদ্রের কিছু যায় আসে না। সমুদ্রের কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমার কথা ভাবছি। তুমি কোন মানসিকতায় এটা পারলে?

মুখে থুতু এসেছিল–ফেলে দিয়েছি। এর বেশি কিছু না। মীরা পুরো বিকেলটা কাটাল চুপচাপ। যেন বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

তীব্র ব্যথা না–এক ধরনের আরামদায়ক ব্যথা। যে ব্যথায় শরীরে ঝিমঝিম ভাব হয়। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পর শরীরে যেমন আবেশের সৃষ্টি হয়–ব্যথাটা ঠিক সে রকম আবেশ তৈরি করছে। কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে ভালো লাগছে না। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে—বমি বমি ভাবটা যাচ্ছে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল সন্ধ্যা মিলানোর আগেই। ভাত, মাছ, সবজি। তবে কিছু কিছু রোগীর জন্যে অন্য ধরনের খাবারও আছে। যেমন তার জন্যে এসেছে দু স্লাইস রুটি, এক বাটি দুধ এবং একটা কলা।

মনজুর আধখান কলা খেল। তার পাশের বেডের রোগী বলল, ভাইজান কলাডা ফালাইয়েন না। রাইখ্যা দেন। রাইতে ক্ষিধা চাপলে খাইবেন। এরা রাইতে কোনো খাওন দেয় না। ক্ষিধায় কষ্ট হয়।

মনজুর বলল, আপনার নাম কী?

রোগী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশ ফিরে কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন একটা জরুরি খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সে দিয়েছে। তার আর কিছু বলার নেই।

স্যার আপনার জন্য খাবার এনেছি।

ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ার হাতে জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার পাশে রোগা পনের-ষোল বছরের একটা ছেলে। সে দেখতে অবিকল জাহানারার মতো। তবে মনে হচ্ছে খুব লাজুক। একবারও মুখ তুলে তাকায় নি।

স্যার ও আমার ছোট ভাই–ফরিদ। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। ওকে নিয়ে এসেছি। ও আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমার সঙ্গে থাকবে কেন?

যদি কখনো কিছু দরকার হয়।

কোনো কিছু দরকার হবে না। আর দরকার হলে কত লোকজন আছে।

স্যার, ও বারান্দায় হাঁটাহঁটি করবে। মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাবে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, জাহানারা তুমি যন্ত্রণা করছি কেন? ওকে নিয়ে তুমি যাও তো। আর শোন, রাতের খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি। খাবারও নিয়ে যাও। এক্ষুণি।

জাহানারার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ভাই ভীত চোখে তাকাচ্ছে বোনের দিকে। জাহানারার চোখ তখন জলে ভিজে উঠল। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ফরিদ আয়।

দুই ভাইবোন ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছে বারান্দার দিকে। ফরিদ ফিসফিস করে বলল, আপা এত লোকজনের সামনে কাঁদছ? সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে! জাহানারা বলল, থাকুক।

ফরিদ বলল, আপা চল বাসায় চলে যাই।

জাহানারা বলল, না।

আমরা তাহলে কী করব?

এখানে থাকব। বারান্দায় হাঁটাহাটি করব।

ফরিদ তার বোনের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। বড় বোনকে সে খুব ভয় পায়।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘর থেকে যেতে পারছে না। এই মানুষটা তার জন্যে যা করেছে তার কিছুই সে ফেরত দিতে পারছে না। কিন্তু সে ফেরত দিতে চাচ্ছে। সে ইচ্ছাটাও এই মানুষটা জানতে পারছে না।

এই মানুষটা তাকে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।। সে সময় কী ভয়াবহ অবস্থা! খবরের কাগজে যেখানে যা দেখেছে সে অ্যাপ্লিকেশন করে দিচ্ছে। ফ্যামিল প্ল্যানিং-এর কর্মী, সেলসম্যান, টেলিফোন অপারেটর, ফুলের দোকানের কর্মচারী, বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। যোগ্যতা আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। অ্যাপ্লিকেশন করা এবং সন্ধ্যায় মন খারাপ করে মার সঙ্গে বসে থাকা এই ছিল কাজ। মা কাঁদতেন নিঃশব্দে এবং এক সময় বলতেন, এখন কী হবে রে?

জাহানারা বলত, জানি না মা।

দেশের বাড়িতে যাবি? তোর এক চাচা আছেন। উনি কি আর ফেলে দেবেন? যাবি দেশের বাড়িতে?

জানি না মা।

তুই বল–এখন কী করব?

আল্লাহু আল্লাহ করা। এ ছাড়া কী আর করবে।

এই রকম অবস্থায় সে ইন্টারভুয দিতে এল থ্রী পি-তে। থ্রী পি-র মালিক নিজেই আছেন ইন্টারভ্যু বোর্ডে। তাঁর সঙ্গে আরো তিনজন। সেই তিনজনের একজন মনজুর সাহেব।

বড় সাহেব বললে, আপনার টাইপিং স্পিড কত?

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, টাইপ জানি না। স্যার।

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললেন, চাওয়া হয়েছে টাইপিষ্ট আর আপনি টাইপ না জেনেই দরখাস্ত করেছেন?

স্যার আমি শিখে নেব।

ডিয়ার ইয়াং লেডি, এটা তো টাইপ শেখার স্কুল নয়। আচ্ছ আপনি যান। নেক্সট।

তেতাল্লিশ জন ইন্টারভ্যু দিচ্ছে। তাদের সবারই নিশ্চয়ই চাকরি প্রয়োজন। কিন্তু তার মতো কি প্রয়োজন? না, তার মতো প্রয়োজন কারোরই নেই। জাহানারা বাড়ি চলে গেল না। সারাদিন বসে রইল। ইন্টারভ্যু শেষ হবার পর আরেকবার সে যাবে। দরকার হলে চিৎকার করে কাঁদবে।

তার প্রয়োজন হলো না। মনজুর বের হয়ে এসে তাকে দেখে বলল, আপনার তো ইন্টারভ্যু হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? জাহানারা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যার আপনার সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?

বলুন।

স্যার আমি এক রাতের মধ্যে টাইপ শিখব।

আপনার কি চাকরিটা খুব বেশি দরকার?

জ্বি।

বসুন এখানে। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

জাহানারা জবাব দিল না।

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কনফারেনস রুমে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল আধঘণ্টা পর। হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। বাড়ি ভাড়া, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে তিন হাজার দুশ টাকা। অকল্পনীয় ব্যাপার।

মনজুর বলল, তোমার বয়স খুবই কম। আমি তুমি করে বললে আশা করি রাগ করবে না। এই নাও অ্যাপিয়েন্টমেন্ট লেটার। এস আমার সঙ্গে চা খাও।

জাহানারা কোনো কথা না বলে পেছনে পেছনে এল। তার খুব ইচ্ছা করছে। চিৎকার করে বলে–থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সে বলতে পারল না। তার গলা ভার ভার হয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে।

বস জাহানারা।

জাহানারা বসল। মনজুর বলল, আমি ধার হিসেবে তোমাকে এখন কিছু টাকা দেব যা তুমি মাসে মাসে আমাকে শোধ করবে। দেব?

জাহানারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জাহানারার মা মানত করেছিলেন–মেয়ের চাকরি হলে একশ রাকাত নামাজ পড়বেন। সেই একশ রাকাত নামাজ শেষ হতে রাত চারটা বেজে গেল। জাহানারা তখনো জেগে। বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে।

মা বারান্দায় এসে বললেন, পৃথিবীতে মানুষ এখনো আছে। এই রকম মানুষ বেশি। থাকার দরকার নেই। কিছু হয়। একবার কি তুই উনাকে এই বাসায় নিয়ে আসবি? শুধু দেখব। উনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জাহানারা কিছু বলল না।

তার তখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পুরোটাই স্বপ্ন। এসব জিনিস বাস্তবে কখনো ঘটে না। স্বপ্নেই ঘটে।

জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন

জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন।

সুভেনিয়ারে লেখা—'Sunrise 71'। পঞ্চাশটি নানা মাপের ছবি। মীরা সুভেনিয়ার হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। মীরার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই–মইন তার সঙ্গে আছে। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, মইনের দিকে। তাকে পুরোপুরি বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। মইন প্রায় ছ ফুটের মতো লম্বা। মাথার বেশিরভাগ চুল সাদা হওয়ায়–চুলে লালচে কালো রং দিয়েছে। লাল চুলের ধবধবে ফর্সা একজন মানুষ। গায়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপর কাজ করা গাঢ় লাল রঙের চাদর। এমন চাদর পরতে যথেষ্ট সাহস লাগে। মইনের সাহসের কোনো অভাব নেই। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। চোখের কোল ঈষৎ ফোলা, এ ছাড়া চেহারায় বয়সের কোনো ছাপ নেই। মীরার সঙ্গে মইনের দেখা এগার বছর পর। এগার বছর আগে এক মেঘলা দুপুরে মীরার মনে হয়েছিল, এই মানুষটিকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনাে মনে হয় না। এই মানুষটি আছে বলেই পৃথিবী আছে, চন্দ্র-সূর্য আছে। এই মানুষটি পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

মইন বেশ উঁচু গলায় বলল, ইন্টারেস্টিং!

তার আশপাশে যারা ছিল সবাই তাকাল। মইন মীরার চোখে চোখ রেখে বলল, স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ছবি অথচ সব ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। মজার ব্যাপার না মীরা?

মীরা কিছু বলল না।

মইন আগের মতোই উঁচু গলায় বলল, আমি এই এক মাসে তিনটা ছবির এক্সিবিশন দেখলাম। তিনটাতেই দেখি ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। সম্ভবত আর্টিস্টরা তাদের ছবির জন্যে বাংলা ভাষাকে যোগ্য মনে করে না।

মীরা বলল, চুপ করুন তো। আপনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই মুশকিল। আর্টিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।

সেই যুক্তিটা শুনতে চাচ্ছি। তুমি কি জান?

না, আমি জানি না। চলুন যাই বেরিয়ে পড়ি। আর ভাল্লাগছে না।

আমার তা ভালোই লাগছে। একটা ছবি কিনব বলে ভাবছি। ছবি কেনার কায়দাকানুন তুমি জানো? কার সঙ্গে কথা বলব?

আমি জানি না। কার সঙ্গে কথা বলবেন। ঐ যে ডেস্কের কাছে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন–উনাকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই আর্টিষ্ট।

বুঝলে কী করে?

সুভেনিয়ারে উনার ছবি আছে।

মইন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হলো, স্বাধীনতা বিষয়ক আপনার ছবিগুলো দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

এ দেশের শিল্পীরা যে স্বাধীনতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তা বোঝা যায়। আপনার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছেছবির নাম দ্যা বায়োনেট। আমি ছবিটি কিনতে চাই। ইউএস ডলারে আমাকে কত দিতে হবে?

আর্টিস্ট ভদ্রলোক খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। কী বলবেন তা ইংরেজিতে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারলেন না। শুধু বললেন–জাস্ট এ মিনিট। তিনি ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সম্ভবত ইংরেজি জানা পরিচিত কাউকে খুঁজছেন যিনি বাঙালি পোশাক-পরা এই বিদেশীর সঙ্গে ছবির দরদাম নিয়ে কথা চালাতে পারবেন।

মইন আবার আগের মতোই ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, ls there any problem sir?

আর্টিস্ট অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, Just a minite. My English very bad.

মইন আবার বাংলায় বলল, আপনার ইংরেজির জ্ঞান অল্প তাহলে ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে দিয়েছেন কেন? আপনি রাগ করবেন না। কৌতুহল থেকে প্রশ্ন করছি। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, দেশের নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করছি।

মইন ভেবেছিল আটিস্ট রেগে যাবে। রেগে গেলেই লজিকবিহীন উল্টাপাল্টা কথা শুরু করবে। তখন মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশান হতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আর্টিস্ট একেবারেই রাগ করল না, বরং হেসে ফেলল। হামতে হাসতেই বলল, আপনাকে দেখে আমেরিকান ভেবেছিলাম। আজকাল আমেরিকানরা খুব পায়জামাপাঞ্জাবি পরে। শাল গায়ে দিয়ে ভাবে–এ দেশের সংস্কৃতি শিখে ফেলছে। আমি ভাই আপনার ইংরেজি শুনে ভড়কে গিয়েছিলোম। আমি সরাসরি ইংরেজি বলতে পারি না। প্রথমে বাংলায় চিন্তা করি

তারপর মনে মনে ট্রানস্লেশন করি। মেট্রিকে ইংরেজিতে কত পেয়েছিলাম জানেন? চৌত্রিশ। একেবারে জানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।

আপনি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।

দিচ্ছিরে ভাই দিচ্ছি। আমার সাথে বারান্দায় আসেন। বারান্দায় চা খেতে খেতে আপনাকে বুঝিয়ে দেই।

মইন বারান্দায় চলে এল। আর্টিস্ট হাসিমুখে বললেন, আর্ট কলেজ থেকে বের হয়েছি চার বছর আগে। কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ছবির এক্সিবিশন করি, কিছু ছবি বিক্রি হয়, তা দিয়ে দিন চলে। ঐসব ছবি কারা কিনে–বিদেশীরা। আমাদের মানুষরা ভাত খেতে পারে না–ছবি কিনবে কী? ঐ বিদেশীদের জন্যেই ক্যাপশনগুলো ইংরেজিতে লেখা।

আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।

তাহলে আরেকটা কথা শুনে যান–সুভেনিয়ারে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও ছবির নাম দেয়া আছে। আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আপনি এতই উল্লসিত ছিলেন যে ব্যাপারটা লক্ষ করেন নি।

সরি। আপনাদের মতো লোকজন যারা সারাজীবন বাইরে থাকে-মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে দেশে আসে এবং দেশের প্রতি বাংলা ভাষার প্রতি, মমতায় অসম্ভব কাতর হয়ে পড়ে–তাদেরকে আমি কী মনে করি জানতে চান?

জানতে চাই না। এই জানাটা আমার জন্যে খুব আনন্দজনক হবে না তা বুঝতে পারছি।

জানতে না চাইলে বলব না। ছবি কি সত্যি সত্যি কিনবেন না চাল দেখালেন?

কিনব। সত্যি সত্যি কিনব।

ছবির দাম দশ হাজার টাকা। ইউ.এস. ডলারে আপনি দুশ ডলার দিলেই হবে। বন্ধু হিসেবে এটা হলো আমার কমিশন।

মইন দুটি একশ ডলারের নোট বের করল।

আর্টিস্ট নির্লিপ্ত গলায় বলল, এক্সিবিশন আরো তিনদিন চলবে। থার্ড ডে-তে বিকেলে যদি আসেন ছবি নিয়ে যেতে পারবেন। কিংবা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলে ছবি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আমি নিজেই আসব। চা খাবার কথা বলে বারান্দায় এনেছিলেন। চা কোথায়?

চা আসছে। একটু অপেক্ষা করুন।

কাউকে চায়ের কথা বলেছেন–এমন শুনি নি কিন্তু।

কাউকে বলি নি তবে ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ওপাশে ঐ যে চায়ের দোকান দেখছেন ওদের বলা আছে যখনই আমাকে বারান্দায় দেখবে–চা নিয়ে আসবে।

মইন লক্ষ করল, একটা বাচ্চা ছেলে দুকাপ চা নিয়ে সত্যি সত্যি আসছে।

মইন জার্মান কালচারাল সেন্টারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল।

মীরাকে বলল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলে কেমন হয়? রিকশা নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরি, কেমন? ক্ষিধেটা ভালোমতো জমুক, তারপর কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এখন বাজে মাত্র বারটা দশ। একটা-দেড়টার দিকে খাওয়া-দাওয়া করব, কেমন?

আজ বাদ দিলে কেমন হয়। কেন জানি ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে–।

ভালো না লাগলে অবশ্যি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীয়বার আর এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নয় তারিখ আমি চলে যাচ্ছি।

টিকিট পেয়ে গেছেন?

ইয়েস মাই ফেয়ার লেডি।

বেশ, তাহলে চলুন রিকশা করে খানিকক্ষণ ঘুরি।

রিকশায় উঠতে উঠতে মইন বলল, তুমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছ–কোনো অসুবিধা নেই। অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে। আমি একজন ভালাে কাম্পেনিয়ন, আশা করি তা স্বীকার কর।

জ্বি স্বীকার করি।

এক সময় আমার জন্যে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে–এটাও বোধহয় ভুল না।

না ভুল না। অপেক্ষা করতাম। যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন আপনাকে দেবতার মতো মনে হত।

এখন মনে হয় না?

না।

এখন কী মনে হয়?

এখন সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে হয়।

সাধারণ?

হ্যাঁ সাধারণ এবং একটু বোকা।

মইন বিস্মিত হয়ে বলল, বোকা! এই প্রথম কেউ আমাকে বোকা বলল!

মীরা সহজভাবে বলল, আমিই বুঝি প্রথম বললাম? আমার ধারণা ছিল আমার আগেও আরো কেউ বলেছে।

না বলে নি। তুমি কী কারণে আমাকে বোকা বলেছ একটু ব্যাখ্যা কর তো।

আপনার মধ্যে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার আছে। প্রবলভাবেই আছে। আপনার মেধার একটি বড় অংশ আপনি ব্যয় করেন কীভাবে লোকদের ইমপ্রেস করবেন তার কায়দা-কানুন বের করার জন্যে। এই যে আর্ট গ্যালারিতে নাটকটা করার চেষ্টা করলেন তার পেছনে একই জিনিস কাজ করেছে। এই যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন তার পেছনেও আমাকে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আছে। আছে না? আপনি নিশ্চয় ভাবছেনএই কাণ্ডটা করার ফলে আমি ভাবব–মানুষটা সাধারণ আর দশটা মানুষের মতো না।

মইন বলল, আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?

পারেন।

আশা করি ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হবে না।

না, হবে না।

মইন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তুমি অসম্ভব স্মার্ট হয়েছ। ভেরি ভেরি স্মার্ট।

আপনি কি ভেবেছিলেন। এখানো আমি ক্লাস টেনের ছাত্রী?

তা ভাবি নি। তবে...

তবে কী?

এ রকম স্মার্টনেসও আশা করিনি। স্মার্টনেসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাঠিন্যও চরিত্রে চলে এসেছে–আই লাইক ইট। হাসছ কেন মীরা?

'আই লাইক ইট' শুনে হাসলাম। মনে আছে আপনি প্রায়ই আই লাইক ইট। বলতেন?

বলতাম নাকি? আমার মনে নেই। রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না, চল কোথাও গিয়ে বসি। রিকশায় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। মুখ দেখা যায় না। তাকিয়ে থাকতে হয় রিকশাওয়ালার পিঠের দিকে।

মীরা বলল, আমার কিন্তু রিকশায় ঘুরতে ভালোই লাগছে। মাথা ধরেছিল। মাথা ধরাটা এখন গেছে।

তাহলে চল খানিকক্ষণ ঘুরি। এক কাজ করি— রিকশা করেই গুলশানে যাই। গুলশানে সি ফুডের ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। লবস্টার খাওয়া যাবে।

মীরা কিছু বলল না।

মইন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মীরার হাঁটুতে হাত রেখেছে। তার মনে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ নেই। মীরাও কোনোরকম অস্বস্তি বোধ করছে না।

মীরা।

জ্বী।

আমার রিকশা নেবার পেছনে যে যুক্তি তুমি দিয়েছ তা পুরোপুরি ঠিক না। রিকশার সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে–ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যে আমি আমার বাঁ হাত তোমার হাঁটুতে রাখলাম— এটাও খুব অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার কাছে। কারণ, আমার এইহাত রাখার জায়গা নেই–হা-হা-হা।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে বসার কোনো বাসনা কি কখনো আপনার মধ্যে ছিল?

মইন বলল, ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তুমি ছিলো নিতান্তই বালিকা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা-ভাবনায় তোমার মাথাটা ছিল ঠাসা। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল এতই প্রবল, এতই তীব্র যে আমার আগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ছিল।

এতদিন পর আপনারই বা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছা হলো কেন?

নি না। বয়স হয়েছে বলেই হয়তো। অবশ্যি তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ। বালিকা বয়সে তোমার চেহারায় দিশহারা দিশহারা ব্যাপার ছিল— তাতে তোমাকে খানিকটা হলেও পাগলের মতো দেখাত।

এখন দেখাচ্ছে না?

না।

মীরা হালকা গলায় বলল, বালিকা বয়সে আমি দিশাহারা ছিলাম না। আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার জন্যে আপনি ছিলেন। এখন আমি দিশাহারা।

দিশাহারা হলেও চেহারায় কিন্তু তার ছাপ নেই। এখন তোমার কথা বল। আমি সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানব। তুমি কথা বলতে থাকবে, আমি শুনব। এক সময় আমি কথা বলতাম।–তুমি হাঁ করে শুনতে; এখন তুমি বলবে–আমি শুনব।

রিকশাওয়ালাও শুনবে।

শুনুক, ক্ষতি কী? তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। হলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্যি তুমি ইংরেজিতেও বলতে পার।

আমার বলার মতো কিছু নেই।

বিয়ে করছি সেই খবর পেয়েছিলাম।

পাওয়ারই তো কথা। আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।

তোমার একটা বাচ্চা মারা গেছে এই খবর কিন্তু জানাও নি। দেশে এসে শুনলাম। মাই ডিপেস্ট সিমপ্যাথি।

মীরা কিছু বলল না। মুখের উপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে। কপাল বিড়বিড় করছে।

মীরা।

জ্বি।

তোমার ম্যারেজ ব্রেকডাউন করল কেন বল তো? আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ স্পেসিফিক্যালি কিছু বলতে পারে না। তোমার বড় ভাই জালাল সাহেবকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনিও কিছু বলতে পারেননি। শুধু বলেছেন–লোকটা গাধা টাইপের। তাকে মানুষ বলা যায় না। সে হচ্ছে ফার্নিচারের মতো। সত্যি?

খানিকটা সত্যি।

তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে একটা ফার্নিচার বিয়ে করবে!

আমি বুদ্ধিমতী না। বুদ্ধিমতী হলে–আপনার জন্যে এমন পাগল হতাম না।

এক সময় আমার জন্যে পাগল হয়েছিলে তার জন্যে এখন কি তুমি রিপেনটেড?

না, রিপেনটেড না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ঐটা। আর আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন চুপ করে থাকব।

মীরা সত্যি সত্যি চুপ করে গেল। রেস্টুরেন্টেও তেমন কিছু বলল না। মইন হড়বড় করে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মীরার কেন জানি মনে হয়েছিল। মইনের গল্প এখন আর তাকে আকর্ষণ করবে না। দেখা গেল–তা নয়। এগার বছর পরেও মইনের গল্প শুনতে তার ভালো লাগছে। শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো লাগছে। তার কারণ কী? বালিকা

বয়সের তীব্র আবেগের স্মৃতির কারণে? এই আবেগের একটি অংশ কি এখনাে রয়ে গেছে?

বুঝলে মীরা, যদিও তুমি আমাকে আধঘণ্টা আগে বোকা বলেছ–আমি বোকা নাই। কারণ আমি যুক্তি দিয়ে চারপাশের জগৎ বুঝতে চেষ্টা করি। একজন বোকা তা পারে না। আমি যদি আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করতাম তাহলে হয়তো এগার বছর আগে তোমাকে বিয়ে করতাম। তার ফল খুব শুভ হত না। আমরা কমপেটেবল না। তেল এবং জলের মতো ঝাঁকিয়ে মেশানো যায়। কিছুক্ষণ রাখলেই আলাদা হয়ে যায়।

আমি অনেক ভেবেচিন্তে এক আমেরিকান তরুণীকে বিয়ে করেছি। আমেরিকান তরুণীরা এশিয়ান পুরুষদের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তারা জানে এশিয়ানরা বিবাহবিচ্ছেদ জিনিসটা খারাপ চোখে দেখে। সহজে বিবাহবিচ্ছেদে যেতে চায় না। আমেরিকান তরুণীরা সঙ্গত কারণেই স্থায়ী সম্পর্কে যেতে চায়।

আমার স্ত্রী মিশেলের হোিমটাউন হচ্ছে–নিউ অরলিন্স। বাবা কোটিপতি। ফার্মিং করে মিলিওনিয়ার হয়েছে। তার বিপুল অর্থের একটা অংশ আমার স্ত্রী পাবে। বিয়ের সময় এটিও আমার হিসেবে ছিল।

ধনী স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অনেকাংশে ক্ষমা করার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দোষত্রুটি তার কিছুই নেই। চমৎকার একটি মেয়ে, A lowing and caring wife. এখন আমার তিনটি বাচ্চা। মিশেল তার বাচ্চাগুলোকে পাগলের মতো ভালবাসে। আমাকে দেবতা মনে না করলেও দেবতার কাছাকাছি মনে করে এবং আমাকে খুশি করার

জন্যে যা করে তাকেও পাগলামির পর্যায়ে ফেলা চলে। একটা উদাহরণ তোমাকে দেই। তোমার বোরিং লাগছে না তো মীরা?

না, বোরিং লাগছে না। ঝগড়াঝাটির গল্প হলে বোরিং লাগত।

একবার মিশেল বলল, তোমার আসছে জন্মদিনে তোমাকে আমি চমৎকার একটা উপহার দেব। এত চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম খুব এক্সপেনসিভ গিফট? সে বলল, মোটেই এক্সপেনসিভ নয়–তবে অসাধারণ। আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। জন্মদিন এসে গেল। মিশেল বলল, তোমার জন্মদিনের উপহার হলো, আমি এখন বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারি। তোমাকে খুশি করার জন্যে আমি একটি বাঙালি পরিবারের কাছে গত আট মাস ধরে বাংলা শিখছি। তুমি এখন বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পার। এই বলেই সে পরিষ্কার বাংলায় বলল–মইন, আমি ভালবাসি, তোমাকে। অল্প নয়। বেশি পরিমাণে ভালবাসি।

মীরা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মইন ভাই। আপনার স্ত্রীর ছবি কি আপনার কাছে আছে? একটু দেখান না।

মিশেলের ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে দেখাতাম। She is quite pretty. তুমি তো কিছুই খাও নি মীরা!

কেন জানি খেতে ভালো লাগছে না।

তুমি খুব ডিসটার্বড?

না।

তোমার বড়ভাই বলছিলেন তুমি নাকি খুব ব্যস্ত হয়ে চাকরি খুঁজছ?

হ্যাঁ খুঁজছি।

আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দেই তাহলে কেমন হয়?

ভালেই হয়।

সব মিলিয়ে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার পাবে।

অনেক টাকা।

বড় একটা কোম্পানির পিআরও–জনসংযোগ। এইসব কাজ মেয়েরা খুব ভালো পারে।

আমিও ভালোই পারব। চলুন আজ তাহলে উঠি?

আরেকটু বস। আইসক্রিম খাও। আইসক্রিম খাবে?

না।

আমি তোমাকে ছোটখাটাে একটা সারপ্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমি টার্মস এন্ড কন্ডিশন্‌স্ দেখো।

মীরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চিঠিটা নিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল। রেখে দিল তার হ্যান্ডব্যাগে। হালকা গলায় বলল, থ্যাংক ইউ।। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মইন নিচু গলায় বলল, তোমার বিষয়ে আমার মনে বড় ধরনের অপরাধবোধ আছে। তোমার জন্যে সামান্য কিছু করতে চাচ্ছি। অপরাধবোধ খানিকটা হলেও কমানোর জন্যে।

মীরা শীতল গলায় বলল, অপরাধবোধ কেন?

মইন চুপ করে রইল।

মীরা আবার বলল, অপরাধবোধ কী জন্যে পরিষ্কার করে বলুন।

থাক বাদ দাও। চল ওঠা যাক।

মীরা উঠল না। চেয়ারে বসেই রইল। তার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ভুরুর কাছে ঈষৎ ঘাম। হাতের পাতলা আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এগার বছর আগের এক দুপুরে এই পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে মারা যাচ্ছে। এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট, অদ্ভুত আনন্দ। সে চুপি চুপি তাদের কলাবাগানে ফ্ল্যাটের তিনতলায় উঠে গেল। সেই ফ্ল্যাটের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। মীরা ঘরে ঢুকে দেখল, ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মইন ভাইয়ের মা শুয়ে আছেন। মীরাকে ঢুকতে দেখে বললেন, আয় মা আয়। কী গরম পড়েছে দেখেছিস। শরীরের সব চর্বি ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মীরা কোনোমতে বলল, মইন ভাই কোথায় খালা?

তিনি ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, আছে বোধহয় তার ঘরে। ঠাণ্ডা পানি চাচ্ছিল। মা, ফ্রিজ থেকে একটা পানির বোতল দিয়ে আয় তো।

মীরা পানির বোতল ছাড়াই ঘরে ঢুকেছিল।

সেই নির্জন ঘুমকাতর দুপুর। বারান্দায় রেলিঙে কা-কা করে একঘেয়ে স্বরে কাক ডাকছে। মাথার উপর কর্কশ শব্দে ঘুরছে ফ্যান। মইন ভাই উবু হয়ে কী যেন লিখছেন। আইন ভাই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কী ব্যাপার মীরা!

মীরা কোনো মতে চাপা গলায় বলল, আপনাকে দেখতে এসেছি।

এগার বছর আগে ঐ ঘরে যা ঘটেছিল তার জন্যে মীরার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে অনেকবার ভেবেছে। নানাভাবে ভেবেছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে–তাকে যদি আবার এই জীবন নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেয়া হয় সে এই ভুল আবারো করবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়েই করবে।

মীরা বাসায় ফিরল সন্ধ্যায়।

মীরার ভাবি বললেন, জাহানারা নামে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছিল। বলল, মনজুর খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।

মীরা বলল, ও আচ্ছা।

দেখতে যেতে চাও?

আজ আর যাব না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

জাহানারা মেয়েটা কে? তিন বার টেলিফোন করেছে।

ওর অফিসে কাজ করে–টাইপিষ্ট।

বলেছে রাত আটটার পর আবার টেলিফোন করবে।

আমাকে চাইলে বলবে। আমি বাসায় নেই।

মীরা তার ঘরে ঢুকে সুইচে হাত দিয়ে শক খেল।

সুইচ ঠিক করা হয় নি। গত দুদিন ধরে তার ঘরের সুইচ নষ্ট। বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা সমস্যা হয় না। রাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হয়। মশারি ফেলতে হয় অন্ধকারে। দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় ওঠার পর চারপাশের অন্ধকার ভয়াবহ লাগে। এক বিন্দু আলোর জন্যে প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে

চোখ বন্ধ করে কল্পনায় আলো-ঝলমল দিন দেখা। ভাগ্যিস কল্পনা করার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল।

মীরা।

মীরা চমকে পেছনে তাকাল। অন্ধকারে মানুষ খুব সহজেই চমকায়। তা ছাড়া কাপড়ের অদ্ভুত এক জোড়া স্যান্ডেল পরে জালালউদ্দিন আজকাল নিঃশব্দে হাঁটা শুরু কুবুন্টু, আচমকা উপস্থিত হন, চিকন গলায় মীরা বলে এমনভাবে ডাকেন যে কেঁপে উঠতে হয়।

তোর ঘরের সুইচ আজো ঠিক করা হয় নি। দোষ আমার। আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে খবর দিতে ভুলে গেছি।

মীরা বলল, নো প্রবলেম।

একটা টেবিল ল্যাম্প লাগিয়ে দিয়ে গেছি। দেখ তো জুলে কিনা।

টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা তা দেখার জন্যে এত রাতে ভাইয়া তার ঘরে আসবে এটা মীরা আশা করে না। নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। এমন কোনো বিষয় যা সহজভাবে বলা যায় না। যার জন্যে অজুহাত তৈরি করে ঘরে আসতে হয়।

মীরা, ল্যাম্পটা কি জ্বলছে? এটার সুইচটাও খারাপ, খুব জোরে চাপ দে। জ্বলছে?

হুঁ। ভাইয়া এস ঘরে এস।

জালালউদ্দিন বললেন, রাত সাড়ে দশটা বাজে–এখন তোর ঘরে ঢুকে কী করব। তুই ঘুমাতে যা। আমিও ঘুমাবে।

তোমার যদি কিছু বলার থাকে বল।

জালালউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার আবার কী বলার থাকবে? তুই কি কিছু বলতে চাস?

না।

তাহলে ঘুমিয়ে পড়। ও আরেকটা কথা, চাকরির জন্যে তোর ছোটাছুটি করার কোনো দরকার নেই। মাসে মাসে তোকে যে হাতখরচ দেই সেটা সামনের মাস থেকে ডাবল করে দেব।

কোনো দরকার নেই ভাইয়া। চাকরি একটা পেয়েছি।

সে কী!

তোমাকে বলেছিলাম না, একজন স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তরুণীর চাকরি পাওয়া খুবই সহজ।

বেতন কত?

বেতন কত–কী চাকরি, সবই বলব, আগে জয়েন করে নেই। তোমার পিঠের ব্যথার অবস্থা কী?

ব্যথা এখন নেই। স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানিস, ব্যথাটা দিনে থাকে–রাতে থাকে না। তুই তো সব কিছুতেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলিস, এই ব্যাপারে তোর যুক্তি কী?

কোনো যুক্তি নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তাহলে ভেতরে আসা। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা সেই খোজে তুমি আসবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জালালউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, তোর সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে তোর ধারণা তুই সবকিছু বুঝে ফেলিস। যেখানে বোঝার কিছু নেই সেখানেও তুই A থেকে Z পর্যন্ত বুঝে ফেলেছিস।

রাগ করছে কেন?

রাগ করছি না। সত্যি সত্যি টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তুই তাও একটা ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে ফেললি!

তুমি যে প্রচণ্ড রাগ করছ তা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছ। ব্যাখ্যা ভুল হলে মোটেই রাগ করতে না।

তুই তোর ব্যাখ্যা নিয়ে থাক। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।

যে কাপড়ের স্যান্ডেলে তিনি নিঃশব্দে হাঁটেন। সেই স্যান্ডেলেই তিনি শব্দ করে হেঁটে নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। রাগে তাঁর গা জুলে যাচ্ছে, কারণ মীরার কথা সত্যি। তিনি আসলেই মীরার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন।

তিনি বলতে এসেছিলেন মীরা যেন মনজুরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাসপাতালে না যায়। অসুখ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মনজুরেরও মাথার ঠিক নেই। সে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে। এইসব শুনে মীরার যদি মনে হয়— ডিভোর্স নেয়া ঠিক হয় নি। তাহলেই সর্বনাশ। সম্পর্ক ছেদের পরের এক মাস খুবই সর্বনেশে মাস। এই এক মাস কেটে যাওয়া সম্পর্কের জন্যে মন হা-হা করতে থাকে। তিনি নিজের চাোখে বন্ধু ফজলুকে দেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া, কিছুতেই বনিবনা হয় না। ফজলু উত্তরে গেলে তার স্ত্রী যায় দক্ষিণে। ফজলু যদি কোনো ব্যাপারে ‘হ্যাঁ’ বলে তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিন বার বলবে ‘না’। এক সময় ফজলু বলল, তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। এই এক বারই দেখা গেল তার স্ত্রীরও একই অভিমত। ডিভোর্স হয়ে গেল। ফজলু হাসতে হাসতে জালালউদ্দিনকে বলল, ভাই বঁচেলাম। জীবন প্রায় যেতে বসেছিল। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

সেই মুক্ত বিহঙ্গকে দেখা গেল ডিভোর্সের দশদিন পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে। মাথার চুল এলোমেলো, উদভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা। তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং কঠিন গলায় বলল, কী চাও তুমি? ফজলু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, বাসায় চল।

বাসায় যাব মানে? কী বলছি তুমি?

ফজলু আবারো বলল, বাসায় চল।

তোমার মাথা আগেই খারাপ ছিল, এখন তো মনে হয় আরো খারাপ হয়েছে। বাসায় কী করে যাব? পাগলের মতো কথা বলছি কেন?

ফজলু একটা রিকশা দাঁড় করাল এবং তৃতীয়বার বলল, বাসায় চল।

তার স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, শাড়িটা বদলে আসি। এই শাড়ি পরে যাব নাকি?

এখনো তারা এক সঙ্গেই আছে। দুটি বাচ্চা হয়েছে। মনের মিলের ছিটেফোটাও নেই। ঝগড়াঝাটি দশগুণ বেড়েছে। তা নিয়ে ফজলুর মাথাব্যথা নেই। জালালউদিনের ধারণা, মীরার ব্যাপারেও তাই হবে। যদিও মীরা আর দশটা মেয়ের মতো না। বেশ খানিকটা অন্য রকম, তবু শেষ পর্যন্ত তাই হবে। বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মনজুর কিছু একটা বলতেই মীরার চোখে পানি এসে যাবে। সে আর হাসপাতাল থেকে নড়বে না। সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে।

তিনি একেবারে গোড়া থেকেই এই ছেলেটাকে বিয়ে না করার জন্যে মীরাকে বলেছিলেন। মীরা তার কথা শোনে নি। কোনোরকম যুক্তিতে কান দেয় নি। আজ তার ফল মীরা কি

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হাতে হাতে দেখছে না? বেশি বুঝলে তার ফল। এই হয়। জালালউদিনের মতিঝিলের অফিসে একদিন মীরা এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, ব্যাপার কী রে?

মীরা বলল, তুমি কি খুব ব্যস্ত?

ব্যস্ত তো বটেই। তুই চাস কী?

পনের মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব।

জরুরি কিছু?

অবশ্যই জরুরি। বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি।

জালালউদ্দিন অসম্ভব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো? চিরকুমারী থাকব, নিজের মতো থাকব ঐ পোকাগুলো মাথা থেকে নেমেছে?

হ্যাঁ নেমেছে।

ছেলেটা কে? আমি চিনি?

না তুমি চেন না–আমি নিজেও চিনি না।

আমি নিজেও চিনি না মানে? তোর সঙ্গে পরিচয় নেই?

পরিচয় আছে। পরিচয় থাকলেও তো সবাইকে চেনা যায় না। ও এই রকম।

ছেলেটা সম্পর্কে বল তো শুনি।

নাম হচ্ছে মনজুর।

নাম যাই হাোক-ছেলেটা কী। কী করে? পড়াশোনা কী?

মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি করে-প্রাইভেট ফার্মে। পড়াশুনো কী জিজ্ঞেস করি নি। বি.এ. পাস নিশ্চয়ই।

পরিচয় কত দিনের?

খুব বেশি হলে দুমাস।

ফ্যামিলির অবস্থা কী?

ফ্যামিলিই নেই-আর ফ্যামিলির অবস্থা।

ফ্যামিলি নেই মানে?

বাবা-মা ভাই-বোন কিছুই নেই। মা মারা গেছেন দুবছর বয়সে, বাবা ষোল বছর বয়সে।

সে-কী!

সূচিপত্র

মীরা খুব শান্ত গলায় বলল, এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। ভালবাসাহীন পৃথিবীতে সে মানুষ হয়েছে। অতি প্রিয়জন সে কাউকে কখনাে পায় নি। এই প্রথম পাবে। প্রবল আবেগ ও ভালোবাসায় সে বাকি জীবনটা আচ্ছন্ন থাকবে।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, উল্টোটাও তো হতে পারে— ভালোবাসা কী এই ছেলে জানেই না। ভালোবাসবে কী?

না জানলে তো ভাইয়া আরো ভালো। আমি তাকে ভালোবাসা শেখাব ।

জালালউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, তোর ব্যাপার কোনোটাই আমার কখনো পছন্দ হয় নি; এটিও হচ্ছে না। আরো ভালোমতো আলোচনা করব। তুই চা খাবি?

খাব। চা খেতে খেতে তুমি কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে? ওকে নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছিস!

হুঁ। বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ঠিক করে রেখেছি চা খাবার সময় তাকে ডাকব। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র বিদায় করে দেব। তোমার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথা বলব। তুমি ছেলেটিকে দেখার পর কী মনে করছ তা শুনব।

দেখার আগেই বলছি আমার পছন্দ না।

মীরা মানিব্যাগ থেকে মুখ-বন্ধ একটা খাম বের করে ভাইয়ের হাতে দিয়ে হালকা গলায় বলল, ছেলেটিকে দেখার পর তার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি যা বলবে তা আমি লিখে এনেছি। তুমি দেখবে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। খামটা এখন খুলবে না ভাইয়া।

জালালউদ্দিন খাম হাতে বসে রইলেন। মীরা বারান্দা থেকে মনজুরকে নিয়ে এল। তিনি ছেলেটির মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না। যা দেখে খুব উৎসাহিত বোধ করা যায়। গায়ে চকলেট রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, ধবধবে সাদা প্যান্টের উপর ভালোই দেখাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো, চেহারা মোটামুটি। চাে‌খ-মুখে এক ধরনের অনাগ্রহ যা এই বয়সী। ছেলেদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

জালালউদ্দিন লক্ষ করলেন, ছেলেটি তাকে ঠিক পাত্তা দিচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে যে তা করছে তা হয়তো না। তার স্বভাবই হয়তো এরকম। তিনি বসতে বলার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল।

তিনি যখন বললেন, চা, না কফি?

সে বলল, কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জালালউদ্দিন সিগারেট বের করে বললেন, চলবে?

সে কোনো কথা না বলে সিগারেট নিল। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম সহজভাবে সিগারেট নেয়া যায় না। সামাজিক কিছু ব্যাপার আছে।

মীরা বলল, ভাইয়া এর নাম মনজুর।

তিনি শুকনো গলায় বললেন, শুধু মনজুর? আগে-পেছনে কিছু নেই? আহম্মদ বা মোহাম্মদ?

মনজুর বলল, জ্বি না।

সে-কী!

মনজুর বলল, বাবা ডাকনাম রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভালো নাম রাখার সুযোগ পান নি। আমার ডাকনাম মঞ্জু। স্কুলের খাতাতে আমার নাম ছিল মঞ্জু। এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় হেড স্যার বললেন, মঞ্জু নাম তো দেয়া যায় না; এটাকে মনজুর করে দেই। মনজুর হা‌েসেন। হা‌েসেন আমার খুবই অপছন্দ। কিন্তু তা বলতে পারলাম না। কারণ হেড স্যারকে খুব ভয় পেতাম।

তাহলে তো আপনার নাম মনজুর হা‌েসেন। মনজুর বলছেন কেন?

এডমিট কার্ড যখন আসল তখন দেখা গেল হেড স্যার আমার নামের শেষে হা‌েসেন দিতে ভুলে গেছেন। আমার আগে যে ছিল, জহির আহাম্মদ, তার নামের শেষে হা‌েসেন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বেচারার নাম এখন জহির আহাম্মদ হা‌েসেন।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। গল্পটা তাঁর খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না।

একদল মানুষ আছে যাদের ভাণ্ডারে এরকম গোটা পাঁচেক গল্প থাকে। গল্পগুলো বলে তারা প্রথম আলাপে লোকজনদের মুগ্ধ করে। সবাই ভাবে বাহ্ বেশ, এই লোকটা রসিক তো। কিন্তু রস যে এই পাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ তা তারা জানতে পারে না।

তাঁর মনে হলো–ছেলেটা কথাও বেশি বলে। নাম জিজ্ঞেস করলে যে লম্বা গল্প ফেঁদে বসে, সে তো সারাক্ষণই বকবক করবে। শেষ পর্যন্ত মীরা এমন একজনকে পছন্দ করল! আশ্চর্য! জালালউদিনের ইচ্ছা ছিল আরো দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করার–যেমন, বাড়ি কোথায়, পড়াশোনা কী পরিমাণ করেছেন; কিন্তু এখন আর আগ্রহ বোধ করছেন না।

মীরা বলল, আচ্ছা তুমি এখন যাও। ভাইয়ার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আগামীকাল এগারটার দিকে তোমার অফিসে যাব।

মনজুর চলে গেল। যাবার আগে সাধারণ ভদ্রতার 'স্লামালিকুম' বলার কথাও তার মনে হলো না। জালালউদিনের মনটাই কালো হয়ে গেল। তিনি দুঃখিত হয়ে ভাবলেনএই ছেলে? শেষ পর্যন্ত এই ছেলে?

মীরা বলল, ভাইয়া এখন তোমার মতামত বল। তোমার মতামত আমার কাগজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।

জালালউদ্দিন বললেন, তোর পছন্দ হয়েছে তুই বিয়ে কর, অসুবিধা কী। এটা তোর ব্যাপার। আমার তো কিছু না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, তুমি এটা বলছো যাতে কাগজের লেখার সাথে তোমার কথা না মেলে। তুমি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলছি। তাই না?

জালালউদ্দিন বিরক্ত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন–মীরার কথা সত্যি। মীরা বলল, উঠি ভাইয়া। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। মীরা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর জালালউদ্দিন খাম খুললেন। মীরা গোটা গোটা করে লিখেছে–

"ভাইয়া, তুমি মত দেবে। তুমি বলবে–হ্যাঁ।
তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলবে। দেখলে
আমার কেমন বুদ্ধি? এরকম একজন বুদ্ধিমতী
মেয়ে কখনো ভুল করবে না। আমি যা করছি
ঠিকই করছি। তুমি ভয় পেয়ে না। ছেলেটা ভালো।"

বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল করে না তার নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে। তিন বছরের মাথায় তাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।

বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন

বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন।

শুধু হাতে আসেন নি। দু ডজন কমলা, এক ডজন কলা এবং চারটা ডাব এনেছেন। একটা হরলিক্সের কোটাও সঙ্গে আছে। তিনি বিছানার পাশে বসতে বসতে বললেন, তুই আছিস কেমন?

মনজুর বলল, ভালো।

ভালো সেটা বুঝতেই পারছি। ভালো না হলে এইভাবে বিছানায় বসে কেউ চা খায়? তোকে চা খেতে দিচ্ছে?

হ্যাঁ দিচ্ছে। শুধু তাই না–ডাক্তার বলেছে ইচ্ছা করলে আমি বাসায় চলে যেতে পারি।

বলিস কি!

গতকাল ডায়ালিসিস হলো। তারপর থেকে শরীর ইমপ্রুভ করছে। এখন বেশ ভালো। যে কিডনিটা কাজ করছিল না সেটাও কাজ করা শুরু করেছে বলে আমার ধারণা।

তোর কিডনি প্রবলেম তাহলে সলভড্। বাঁচলাম। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রয়োজনে একটা তোকে দেব।

মনজুর দরাজ গলায় বলল, সেই সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না মামা। সুযোগ এখনো আছে। একশ ভাগ আছে। কিডনি বদলাতে হবে।

বদরুল আলম চুপ করে গেলেন।

মনজুর বলল, শুনে মনে হচ্ছে চুপসে গেলে!

বদরুল আলম বললেন, চুপসে যাব না তো কী? এই বয়সে কিডনি দিলে কি আর বাঁচব? অপারেশনের ধকলই সইবে না। তুই ঠিকই বেঁচে থাকবি, মাঝখান থেকে আমি শেষ।

তোমার আর বাঁচার দরকার কী? অনেক দিন তো বাঁচলে।

এই বাঁচা কি কোনো বাঁচা? পরিশ্রম করতে করতে জীবন গেল। সুখের মুখ দেখলাম না– এখন একটু দেখতে শুরু করেছি, এখন যদি মরে যাই তাহলে লাভটা কী?

তাও ঠিক।

বদরুল আলম বললেন, নে কলা খা।

কলা খাব না মামা, তুমি খাও।

কলা হলো ফ্রুটসের রাজা। একটা কলায় কতটুকু আয়রন থাকে জানিস?

কতটুক থাকে?

অনেক–বলতে গেলে পুরোটাই আয়রন।

তুমি বসে বসে আয়রন খাও। আমার ইচ্ছা করছে না। আর কিডনি নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এমনি বললাম

কিডনি লাগবে না?

লাগবে হয়তো। লাগলেও তোমারটা না।

বদরুল আলম বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। দুটা কলা এবং একটা কমলা খেলেন। হৃষ্ট গলায় বললেন, তোর এখানে কোনো লোকটাকে নেই? একটা দা পেলে ডাব কেটে খাওয়া যেত।

এখানে কোনো লোক নেই মামা। ডাব সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার অফিসের লোকজন কেটে দেবে।

ডাবের শাঁসেও কিন্তু আয়রন আছে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, তুমি আয়রনের এত খোঁজ কোথায় পেলে বল তো

কাঠের মিস্ত্রি বলে তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?

বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি।

বদরুল আলম বললেন, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না।

মনজুর বলল, এখানের চা মুখে দিতে পারবে না মামা। ভয়াবহ চা। প্রচুর চিনি, প্রচুর দুধ এবং প্রচুর জীবাণু।

প্রচুর জীবাণু মানে?

হাসপাতাল হচ্ছে অসুখের গুদাম। এখানকার চায়ে জীবাণু থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কিলবিল করছে জীবাণু। তুমি বরং চলে যাও।

তুই আমাকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছিস কেন?

বিদায় করতে চাচ্ছি। কারণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার গা থেকে তার্পিন তেলের গন্ধ আসছে— গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে।

বদরুল আলম দুঃখিত গলায় বললেন, তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস? রেগে থাকলে সেটা খোলাখুলি বল। খামাখা তার্পিন তেলের কথা আনলি কেন? আমি কি গায়ে তার্পিন তেল মাখি, নাকি আমি একটা ফার্নিচার যে আমার গায়ে দুবেলা তার্পিন তেল দিয়ে বার্নিশ করা হয়? তোর রাগটা কী জন্যে, শুনি?

আমার কোনো রাগ নেই।

অবশ্যই আছে। এবং কারণটাও জানি। কাঠমিস্ত্রি হয়েছি বলেই কি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না?

ঠিক আছে, কী কারণ তুমি বল।

আমি তোকে বলেছিলাম তোর বিয়েতে একটা খাট বানিয়ে দেব। এমন খাট যে যেই দেখবে ট্যারা হয়ে যাবে। সেই খাট দেয়া হয় নি–তোর রাগটা এই কারণে। কাঠ এখন কেনা হয়েছে। বার্মা টিক খুঁজেছিলাম, পাইনি। চিটাগাং টিক কিনেছি। সিজন করা কাঠ। খুব ভালো জিনিস। ছমাসের মধ্যে তোর খাট আমি দেব–যা কথা দিলাম।

ছমাস আমি টিকব না মামা।

পাগলের মতো কথা বলিস না।

সত্যি বলছি ছমাস টিকব না।

ডাক্তার বলছে এই কথা?

ডাক্তাররা কি আর সরাসরি এই কথা বলে?

তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিস?

হ্যাঁ।

কী স্বপ্ন?

মনজুর হাসল, কিছু বলল না। বদরুল আলম উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, স্বপ্নটা কখন দেখেছিস? মাঝরাতে, না শেষরাতে? মাঝরাতের স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই। শেষরাতের স্বপ্ন হলে চিন্তার কথা। শেষরাতেই দেখেছি। ঘুম ভেঙে দেখি সকাল।

বদরুল আলম আরো উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, পেট ঠিক ছিল তো? বদহজম অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে–লে যা।

বদহজম-টজম কিছু না। পেট ঠিকই ছিল।

স্বপ্নে কী দেখলি?

দেখলাম আমি এই বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ধবধবে চাদরে আমার সারা শরীর ঢাকা। আমি বুঝতে পারছি আমি মারা গেছি। একজন ডাক্তার এসে বললেন, ডেডবডি এখনো সরানো হয় নি? কোনো মানে হয়? খামাখা একটা বেড দখল করে আছে। সবাই তখন ধরাধরি করে আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। আমার বিছানায় নতুন একজন রোগী চলে এল। তার কিছুক্ষণ পর জাহানারা হাসপাতালে ঢুকল। সে অবাক হয়ে সবাইকে জুম করছে, সার কাোথায়? কেউ বলতে পারছে না। অথচ আমি মেঝেতেই পড়ে আছি।

জাহানারাটা কে?

আমাদের অফিসে কাজ করে।

স্বপ্নটা এখানেই শেষ, না আরো আছে?

আর নেই। তার পরপরই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এই স্বপ্ন দেখে তোর ধারণা হলো তুই আর ছমাস বাঁচবি?

হুঁ।

তুই তো দেখছি বিরাট গাধা। তোকে আমি খাবনামা বই দিয়ে যাব। পড়ে দেখিসপরিষ্কার লেখা আছে— স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখলে দীর্ঘায়ু হয়। তুই বাঁচবি অনেক দিন।

বাঁচলে তো ভালোই। তুমি কি এখন যাবে; না বসবে। আরো খানিকক্ষণ?

বসি কিছুক্ষণ। আমার তো আর অফিস না যে ঘড়ির কাটা ধরে যেতে হবে। আমার হলো স্বাধীন ব্যবসা। ইচ্ছা হলে যাব, ইচ্ছা না হলে যাব না। সারাদিন তোর সঙ্গে বসে থাকতে পারি। কোনো সমস্যা না।

মনজুর আঁতকে উঠে বলল, তুমি কি সারাদিন থাকার প্ল্যান করছ?

বদরুল আলম বললেন, কোন প্ল্যান-ট্যান নেই। এককাপ চা খেতে পারলে হত।

তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। দয়া করে চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।

মনজুর বিছানা থেকে নামল। শরীর বেশ ভালো লাগছে। মাথা ঘুরছে না বা দুর্বলদুর্বল লাগছে না। বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? গরম পানিতে ভালো করে গোসল করে একটা লম্বা ঘুম দিলে শরীর অনেকখানি ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

মনজুর গেল চায়ের খোঁজে।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল জাহানারা। অবিকল স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটা ব্যাপার হল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা সুন্দর। শুধু সুন্দর না, বেশ সুন্দর। সবচে' সুন্দর তার গলার স্বর। কানে এসে গানের মতো বাজে।

জাহানারা আবার বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম বললেন, তোমার নাম কি জাহানারা?

জাহানারা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁদোকাদো গলায় পাশের বেডের রোগীকে বলল, স্যার কোথায়?

জাহানারা আজ অফিসে যায় নি। বাসা থেকে সরাসরি চলে এসেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা লেগে পানির একটা গ্লাস ভেঙেছে। তখনই তার বুক ছ্যাৎ করে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে।

যে বাসে আসছিল মাঝপথে সেই বাসের চাকা বসে গেল। খারাপ সংবাদ, খারাপ সংবাদ, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ। কখনো বাসের চাকা বসে না–আজ বসল কেন?

বদরুল আলম আবার বললেন, মা, তোমার নাম কি জাহানারা?

জাহানারা বলল, এই বিছানায় যে রোগী ছিলেন উনি কোথায়?

মনজুর আমার জন্যে চা আনতে গেছে। তুমি বস এখানে। আমি মনজুরের মামা হই। জাহানারা তোমার নাম তাই না?

জ্বি।

কী করে বললাম বল তো?

জাহানারা তাকিয়ে রইল। সে সত্যি বুঝতে পারছে না।

কলা খাবে? খেয়ে দেখ। মনজুর খাবে বলে মনে হয় না। নাও একটা খাও। প্রচুর আয়রন আছে।

ফরিদও জাহানারার সঙ্গে এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

মনজুর চা নিয়ে ফিরে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাঙ্ক, সঙ্গে দশ-বার বছরের একটি ছেলে যার এক হাতে দুটা খালি কাপ, অন্য হাতে কয়েকটা নোনতা বিস্কিট। সে বিস্কিটগুলো বদরুল আলমের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তিনি বললেন, মারব এক থাপ্পড়, হাতে করে বিস্কিট নিয়ে আসছে!

ছেলেটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ইচ্ছা হইলে খাইবেন, ইচ্ছা না হইলে নাই। থাপ্পড় মারমারি ক্যান?

মনজুর বলল, খেয়ে ফেলেন মামা। হাত যেমন নোংরা প্লেটও সেরকম নোংরা। বরং হাতে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আন্তরিকতা আছে।

জাহানারা হাসছে। তার খুব ভালো লাগছে। যে মানুষটা মর-মর হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তাকে এমন সুস্থ স্বাভাবিক দেখবে সে ভাবেই নি। চোখের নিচের কালিও অনেক কম। গালের খোচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটে ফেললেই কেউ বুঝবে না। এই মানুষটা বড় ধরনের অসুখে ভুগছে।

জাহানারা, কখন এসেছ?

কিছুক্ষণ আগে।

চা-বিস্কিট কিছু খাবে?

জ্বি না।

কলা খেতে পা◌ের। প্রচুর আয়রন আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মামাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

বদরুল আলম চা খাচ্ছেন। নোনতা বিস্কিটও খাচ্ছেন। দোকানের ছেলেটি কাপ ফেরত নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার হাতে এখনো দুটা বিস্কিট ধরা আছে।

জাহানারা বলল, আপনার শরীর তো সেরে গেছে বলে মনে হয়।

মনজুর বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। দশটার দিকে ডাক্তার এসে দেখবে। তাকে বলব, আমাকে রিলিজ করে দিতে। আবার যখন শরীর খারাপ হবে, ভর্তি হব। ইতিমধ্যে কিডনি জোগাড়ের চেষ্টা চালাব। পাওয়া গেল তো ভালোই। না পাওয়া গেলে নাই।

জাহানারা বলল, স্যার আমার কেন জানি মনে হচ্ছে। আপনার কিছুই লাগবে না।

না লাগলে তোই ভালোই।

বদরুল আলম বললেন, আমি তোকে একজন পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব। অত্যন্ত পাওয়ারফুল পীর। ক্ষমতা অসাধারণ। পান-বিড়ির একটা দোকান চালায়। বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নাই। গভীর রাতে, মিনিস্টার, সেক্রেটারি, এরা আসে।

মনজুর বলল, দিনে আসে না কেন?

দিনে আসলে তা◌ে লাভ নাই। দিনের বেলা পীর সাহেব হচ্ছে দা◌েকানদার। রাতে পীর।

সাহেবকে গিয়ে আমার অসুখের কথা বলবে?

হুঁ। এরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে? আজ যাবি?

না।

তোকে যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে চল না। আমার সাথে। ক্ষতি তো কিছু নাই।

জাহানারা বলল, স্যার যান না। পীর ফকির সাধু সন্ন্যাসী এদের অনেক রকম ক্ষমতা থাকে।

মনজুর বলল, এদের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লোকজনদের ধোঁকা দেয়া। এর বাইরে এদের কোনো ক্ষমতা নেই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলেই তুই বুঝে ফেললি? আগে কথা বল–তারপর ডিসিশান নে। পীর সাহেবের তাবিজ যে গলায় বাধতেই হবে, এমন তো কথা নেই।

উনি কি তাবিজও দেন নাকি?

না। মাঝে মাঝে গলায় হাত বুলিয়ে দেন।

গলায় কেন?

আমি কী করে বলব কেন! তুই যাবি কিনা বল! আমি ফল পেয়েছি। হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

আচ্ছা যাও যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্যে যাবে। যদি হাসপাতাল থেকে ছাড়ে তাহলে সরাসরি চলে যাব তোমার ওখানে। এখন দয়া করে তুমি বিদায় হও। জাহানার তুমিও যাও। আমি এখন খানিকক্ষণ ঘুমাবে। ঘুম পাচ্ছে।

জাহানারা বলল, স্যার আপনি ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসে থাকি। আমি স্যার তিন দিনের ছুটি নিয়েছি।

তিনদিনেরর ছুটি নেয়ার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই কাল অফিসে জয়েন করছি।

স্যার এই শরীরে আপনি অফিসে জয়েন করবেন?

হুঁ।

যে দুটি বিস্কিট নিয়ে ছেলেটি বসে ছিল, বদরুল আলম সেই দুটিও নিয়ে নিলেন এবং নিচু গলায় বললেন, বাবা চট করে আরেক কাপ চা আনতে পারবি?

গলির ভেতর গলি, তার ভেতর আরেক গলি।

মনজুর বলল, তোমার পীর সাহেব তো মামা ভালো আস্তানা বের করেছেন!

বদরুল আলম বললেন, পীর-ফকির মানুষ, এরা কি ধানমণ্ডি গুলশান এলাকায় থাকবে? এরা থাকবে চিপা গলিতে বস্তিতে।

তুমি একে খুঁজে বের করলে কীভাবে?

সে বিস্তর ইতিহাস। তোকে একদিন বলব। হাঁটতে পারছিস?

হুঁ।

শরীরটা ঠিক আছে তো?

এখনো আছে। চোখে এখন কিছুই দেখছি না, নর্দমায়-টর্দমায় পড়ব না তো?

তুই আমার হাত ধরে ধরে আয়।

তুমি কি এখানে প্রায়ই আস?

সপ্তাহে একদিন আসি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

যেরকম নির্জন রাস্তা, আমার তো মনে হচ্ছে ফেরার পথে হাইজ্যাক হয়ে যাব। তোমার কাছে টাকা-পয়সা বিশেষ নাই তো?

কিছু আছে, অসুবিধা নাই-বাবার কাছে যারা আসে তারা কখনো হাইজ্যাকড় হয় না।

উনাকে বাবা ডাক নাকি?

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মনজুর বলল, তুমি বাবা ডাকলে তো আমাকে দাদাজান বলতে হয়।

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, উনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিস না। এরা ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করে না।

বাবা, দোকানের ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ধাক্কাধাক্কির পর উঠে বসলেন। মধ্য বয়েসী একজন ভদ্রলোক–যাকে বাবা ডাকা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যবান মানুষ। গায়ে হলুদ রঙের গলাবন্ধ, নোংরা সুয়েটার। মাথার চুল লম্বা, চোখ লাল। ঘুমাবার আগে বাবা হয়তো মুখ ভর্তি করে পান খেয়েছিলেন। পানের রসে কালো ঠোঁট লালচে হয়ে আছে। ঘুম ভাঙানোয় বাবাকে বেশ বিরক্ত মনে হলো। কঠিন গলায় বললেন, কী চাই?

আমাকে চিনেছেন? আমি উড কিং-এর মালিক। বদরুল আলম। আর এ আমার ভাগ্নে। এর নাম মনজুর।

কী চাই?

কিছু চাই না। একে একটু দোয়া করে দেন–এর শরীরটা ভালো না।

নিজের দোয়া নিজের করা লাগে। অন্যে কী দোয়া করব। এখন যান বাড়িতে গিয়া ঘুমান।

একটু গলায় হাত দিয়ে দেয়া করে দেন।

বললাম তো বাড়িতে গিয়া ঘুমান। ঘুমের মধ্যেও দোয়া আছে। ঘুমের সময় শাইল আরাম পায়। শইল দোয়া করে। হেই দোয়া কামে লাগে।

মনজুর হাই তুলে বলল, মামা চলুন যাই। আমার সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে।

বদরুল আলম যেতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দেয়া না করিয়ে তিনি যাবেন না।

আমার ভাগ্নের শরীরটা খুবই খারাপ। একটু যদি দেয়া করেন।

বাবার মন মনে হয় গলল, বাঁ হাত উঠিয়ে আচমকা মনজুরের কণ্ঠার উপর রাখলেন। মনজুরের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে ওঠার ঠিক আগে আগে হাত সরিয়ে নেয়া হলো। তখনো মনজুরের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি।

শইল তো খারাপ, খুবই খারাপ।

বদরুল আলম বললেন, আপনি কি দোয়া করেছেন?

না। দোয়ায় কিছু হওনের নাই। আইচ্ছা শুনেন, আফনের কি কোনো সন্তান মারা গেছে?

কয়েক মুহূর্ত হ'কচকিত থেকে মনজুর বলল, জ্বি।

কন্যা সন্তান?

জ্বি। কীভাবে বললেন?

অনুমানে বলছি। অনুমান। আইচ্ছা অখন যান। পরে একদিন আইস্যেন। দেখি কিছু করা গেলে করমু।

বাবা দোকানের ভিতর ঢুকে ঝাঁপ ফেলে দিলেন। উৎকট বিড়ির গন্ধ পাওয়া গেল। বাবা সম্ভবত ঘুমাবার আগে বিড়ি খান।

বদরুল আলম বললেন, উনার পাওয়ার দেখলি? কীভাবে বলে দিল!

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি এসে আগে বলে গেছ। খুব অন্যায় কাজ করেছ মামা।

বদরুল আলম হতভম্ব গলায় বললেন, আমি আগে এসে বলে গেছি?

হুঁ।

আমার স্বার্থ কী?

আমাকে চমকে দিবে। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবব–পীরবাবার কী ক্ষমতা! ভাগ্যিস মামা আমাকে ইনার কাছে এনেছেন। তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হব। তুমি তা দেখে খুশি হবে–এটাই তোমার স্বার্থ। চল যাই।

দুজনে হাঁটছে।

মনজুর খুবই ক্লান্ত বোধ করছে। মামার সঙ্গে তার আসাই ঠিক হয় নি। উচিত ছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা। ডাক্তাররা তাকে ছাড়তে রাজি হয় নি। মনজুর যখন বলল, আমি তো এখানে শুয়ে থাকি, বাসায় গিয়েও শুয়েই থাকব। নিজের পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে ঘুমাবে। আর আপনাদেরও তো খালি বেড দরকার। দরকার না?

এতেই ডাক্তাররা রাজি হলেন। ডাক্তারদের একজন বললেন, প্রিয় মানুষের সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে শরীরে–ঠিক আছে যান।

মনজুর চলে এসেছে–এবং তার একজন প্রিয় মানুষ মেজো মামার সঙ্গে ঘুরছে। উচিত হয় নি; একেবারেই উচিত হয় নি।

মনজুর।

জ্বি।

তুই কি আমার উপর রাগ করলি নাকি?

রাগ করব কেন?

পীর সাহেবকে তোর বাচ্চা মারা যাবার খবরটা আগে দেয়া ঠিক হয় নি।

তুমি তাহলে আগে-ভাগে খবর দিয়ে রেখেছ?

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মাফলার দিয়ে কান ঢেকে দিলেন। ভাবটা এরকম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কাজে ব্যস্ত।

বমি বমি লাগছে মামা।

বলিস কী, শরীর কি আবার খারাপ করেছে?

মনে হচ্ছে সে রকম।

মনজুর রাস্তার পাশে বসে হড়হড় করে বমি করতে লাগল। বদরুল আলম দোয়া কুনুত পড়ে মনজুরের মাথায় ফুঁ দিতে লাগলেন।

এত বমি করছিস–ব্যাপারটা কী? তুই দেখি নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলবি।

মনজুর এক সময় উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেই তার চাে‌খ স্বাভাবিক ছিল। এখন টকটকে লাল। যদিও অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

মামা, হাত ধরে ধরে তুমি আমাকে একটা রিকশায় নিয়ে তোল তো।

মনজুর তুই কি, আমার উপর খুব বেশি রাগ করেছিস?

হুঁ করেছি–আমার বাচ্চার মৃত্যুর খবর আমি কাউকে বলি না। তুমি সেটা তৃতীয় শ্রেণীর এক ভণ্ডকে বলেছ। উচিত হয় নি।

তৃতীয় শ্রেণীর বলছিস কেন? উনি খুব কামেল মানুষ। মানুষের চেহারা ছবি দিয়ে তো সব কিছু বিচার করা ঠিক না।

আমি চেহারা-ছবি দিয়ে কাউকে বিচার করি না। এই লোকটা ভণ্ড। তুমি প্রতি সপ্তাহে এক বার তার কাছে আসা। তোমাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। অথচ আজ না। চেনার ভান করল। না চেনার ভান করলে তার জন্যে সুবিধা।

সুবিধা কী?

সে যখন আমার অতীত বলল, তখন আমি আর সন্দেহ করলাম না যে তুমি আগেই সব বলে বসে আছ। আর কী কী বলেছ? ডিভোর্সের কথাটা বল নি?

বদরুল আলম কিছু বলার আগেই মনজুর আবার বসে পড়ল। হড়হড় করে দ্বিতীয় দফায় বমি করল।

ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে

ছদিন পর মনজুর অফিসে এসেছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে না। সে অসুস্থ। বরং চকলেট রঙের শার্টে তাকে অন্যদিনের চেয়ে হাসিখুশি লাগছে। অনেকদিন পর ক্লিন শেভ করলে গালে এক ধরনের আভা দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে।

কুদ্দুস বিক্ষিত হয় বলল, স্যার আপনে অফিসে আইলেন?

মনজুর বলল, আসা কি নিষেধ নাকি?

কুদ্দুস দাঁত বের করে হাসল। অফিসের অন্য কেউ হাসল না। কনসট্রাকশন উল্লে মানেজার পরিমল বাবু বললেন, শুনেছিলাম। আপনি গুরুতর অসুস্থ, তা বাোধহয় মিথ্যা।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছু বলল না। পরিমল বাবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে না। কেন করে না তাও জানে না। এমনিতে পরিমল বাবু নিতান্তই ভদ্রলোক, পরোপকারী। অফিসের কাজেও অত্যন্ত দক্ষ। তিনি খুব অল্প সংখ্যক কর্মচারীদের একজন যিনি দশটাপাঁচটা অফিস করেন এবং চেয়ারের পেছনে কোট বুলিয়ে বাড়ি চলে যান না।

পরিমল বাবু বললেন, মনজুর সাহেব অফিসে আপনার সমস্যা কী বলুন তো?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো কোনো সমস্যার কথা জানি না।

না, মানে পে-স্লিপ দেখছিলাম, লক্ষ করলাম পে-স্লপে আপনার নাম নেই। এ মাসে বেতন হয় নি।

ও আচ্ছা।

আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন তো ব্যাপারটা কী? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, তারপর ভাবলাম, আমি বাইরের লোক, আই মিন আমি ইন্‌ভল্‌ভড নই। যার সমস্যা তাকেই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে। আপনি ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করুন।

মনজুর বলল, মনে হয় চাকরি চলে গেছে।

চাকরি চলে গেছে মানে? এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি জন্মলগ্ন থেকে আছেন। বলতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার নিজের হাতে তৈরি। সেখানে বিনা নোটিশে চাকুরি চলে যাবে? আপনি এক্ষুণি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।

আচ্ছা বলব।

স্যারও অফিসে আছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে দেখুন কী ব্যাপার। আপনার মতো মানুষের হুট করে চাকরি চলে যাওয়া তো ভয়াবহ কথা। আপনারই যদি এই ব্যাপার হয় তাহলে আমাদের কী হবে?

মনজুর ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেল না। ক্যাশিয়ার সাহেব নিজেই এলেন। বেশ খানিকক্ষণ শরীরের খোঁজখবর নিয়ে বললেন, আপনি কি খবর কিছু শুনেছেন?

কোন খবরের কথা বলছেন?

আপনার পে-স্লিপের ব্যাপার।

শুনলাম।

আমি যথারীতি সব পে-স্লিপ বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। বড় সাহেব সব পে-স্লিপেই সই করলেন, আপনারটায় করলেন না।

মনজুর উদাস গলায় বলল, না করলে কী আর করা।

আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। আমরা সবাই এই ব্যাপারে আপসেট। আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ মানুষ। এখন টাকা দরকার। আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন...

ক্যাশিয়ার সাহেব কথা শেষ করলেন না। অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে গেলেন। মনজুরও কিছু জিজ্ঞেস করল না। বেশি জানা ভালো না। জানলে মন খারাপ হবে।

মনজুরকে বড় সাহেবের ঘরে নিজ থেকে যেতে হলো না। বড় সাহেবই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মনজুর ঘরে ঢোকামাত্র নুরুল আফসার বললেন, তোর শরীর কেমন?

মনজুর বলল, ভালো না। মারা যাচ্ছি বলে মনে হয়।

কবে নাগাদ মারা যাচ্ছিস।

সম্ভবত মাস ছয়েক টিকিব।

কিডনি বদলে ফেল।

চেষ্টা করছি।

পাচ্ছিস না?

না।

এই দরিদ্র দেশে কিডনি পাবি না একটা কথা হলো? পাঁচশ টাকা দিয়ে এই দেশে মানুষ খুন করা যায়। তুই কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন দে, লিখে দে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দেয়া হবে; দেখবি পাঁচশ এপ্লিকেশন পড়ে গেছে। নে সিগারেট নে।

মনজুর সিগারেট ধরাল।

চা খাবি মনজুর?

না।

খা এক কাপ আমার সঙ্গে। মুখ অন্ধকার করে বসে আছিস কেন? ইজ এনিথিং রং?

না।

ভালো করে চিন্তাভাবনা কর; তারপর বল–ইজ এনিথিং রং?

না।

ভেরি গুড়। তোর বেতন এ মাসে হয় নি সেটা দেখেছিস?

শুনলাম।

কিছু বলতে চাস?

না।

এক অক্ষরে সব কথার উত্তর দিচ্ছিস-ব্যাপার কী? তুই কি কোনো কারণে আমার উপর রেগে আছিস?

না। রেগে নেই।

তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? একটা রসিকতা শুনবি–শোন, রিডার্স ডাইজেস্টে পড়লাম। এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় বললেন, সবাই বলে পরকালে টাকা পয়সা কোনো কাজে লাগে না। কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি মৃত্যুর পর সঙ্গে করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে যেতে চাই। ভদ্রলোক নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, আমার কফিনে এই টাকাটা দিয়ে দিও। ভুল হয়

না যেন। তাঁর স্ত্রী করলেন কী–নগদ ডলার রেখে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক দিয়ে দিলেন। হা-হা-হা।

নুরুল আফসার সমস্ত শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তুই হাসলি না, ব্যাপার কী? যাকে বলছি সেই হাসছে। হা-হা-হা। শুধু পলিন হাসে নি। সে চোখ গোল গোল করে বলেছে–What is so funny about it? ভালো কথা, পলিন তার তিন কন্যা নিয়ে আমেরিকা চলে যাবে বলে কথা হচ্ছে। যাকে বলে পুরোপুরি চলে যাওয়া।

তুই? তুই একা থাকবি?

না। আমিও চলে যাব।

মনজুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা রসিকতা কিনা। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। নুরুল আফসার বললেন, পলিন কিছুতেই নিজেকে এডজাস্ট করতে পারছে না। বাচ্চাগুলোও পারছে না। গত চার মাস ধরে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ঝগড়া চলছে, মনকষাকষি চলছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

ফার্মের কী হবে?

একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে। নে আরেকটা সিগারেট নে। সিগারেটের সঙ্গে এক ঢোঁক হুইস্কি খাবি? আছে এখানে। সমানে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। বাসায় খাই। অফিসে এসেও খাই।

নুরুল আফসার ড্রয়ার খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন, গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, খাবি?

না।

আমি পুরোপুরি এলকোহলিক হয়ে গেছি। আমার আগে এলকোহলিক হয়েছে পলিন। আমেরিকায় পৌঁছেই এর চিকিৎসা করাতে হবে। পলিন এলকোহল ছাড়া কোনো তরল পদার্থই খাচ্ছে না। গত দুমাসে সে এক চামচ বিশুদ্ধ পানি খেয়েছে কিনা আমি জানি না।

আগে তো কিছু বলিস নি।

কেন বলব? মীরা যে তোকে লাথি মেরে চলে গেল তুই কি আমাকে বলেছিস?

লাথি মেরে চলে যায় নি।

ঐ একই হলো।

নুরুল আফসার গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢাললেন। পানি মেশালেন না। ঢেলে দিলেন গলায়। তাঁর মুখ বিকৃত হলো না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই চাোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, মনজুর তোকে একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোন।

শুনছি।

এই ফার্ম ছেড়ে যাওয়া আমার জন্যে কী রকম কষ্টের তা নিশ্চয়ই তুই জানিস। জানিস না?

জানি।

পলিনকে ছেড়ে দেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে পাগলের মতো ভালবাসি। তাছাড়া ও গেলে আমার বাচ্চাগুলোও যাবে। যাবে না?

হ্যাঁ যাবে।

কাজেই ওকে খুন করার একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আমার আছে। ওর হুইস্কির সঙ্গে খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেই হলো। আর্সেনিক জোগাড় করেছি। একটা শুভদিন দেখে জিনিসটা মেশানো হবে। বারই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে খুব শুভদিন–ওর জন্মদিন।

তোর নেশা হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

নেশা হয় নি। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আজই তো বার তারিখ, তাই না?

হ্যাঁ।

তুই কি সত্যি খাবি না? খা একটু আমার সঙ্গে। মন্দ হচ্ছে এমন এক তরল পদার্থ যা কখনো একা খাওয়া যায় না। তাছাড়া জিনিসটা কিডনির জন্যে ভালো। সত্যি ভালো।

মনজুর চুপ করে রইল।

নুরুল আফসার বললেন, না খেলে চুপচাপ বসে থাকবি না। চলে যা। আর পলিনকে খুন করা সম্পর্কে যা বললাম। সবই রসিকতা। নেশা হলেই বলি। নেশা হয়েছে–তোকে বলেছি। নেশা কেটে গেলে সব ভুলে যাব। তবে মনটা খারাপ। খুবই খারাপ। এত কষ্ট করে ফার্মটা তৈরি করেছি–সব জলে ভেসে যাবে। কাঁদতে ইচ্ছা হয়। নেশা খুব বেশি হলে কাদি। মুশকিল হচ্ছে নেশা আগের মতো হয় না। আমি পুরো বোতল শেষ করে ফেলব। কিন্তু তেমন নেশা হবে না। যা তুই যা। Leave me alone.

মনজুর বেরিয়ে এল।

জাহানারা হাতে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অসম্ভব মলিন। মনে হচ্ছে টাইপ করতে করতে সে খানিকটা কাঁদছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল দেয় বলে মনজুরের ধারণা ছিল না। এই মেয়েটা দেয়। মীরাও দিত। মীরার সঙ্গে কি এই মেয়েটির কোনো মিল আছে? না। কোনো মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দুরকম।

জাহানারা বলল, স্যার আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

মনজুর বলল, টাইপ হয়ে গেছে?

জ্বি।

ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দাও। বল পরপর তিনদিন ছাপাতে।

আপনি কি দেখে দেবেন না?

না।

স্যার একটু দেখে দেন।

মনজুর দ্রুত চোখ বুলাল—

কিডনি প্রয়োজন
একটি কিডনি কিনতে চাই। কেউ আগ্রহী হলে
অতি সত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠিকানা দেয়া আছে, উড কিং-এর। কেয়ার অফ বদরুল আলম। মনজুরের মনে পড়ল– মামাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয় নি। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার আগেই জানানো উচিত।

জাহানারা বলল, স্যার আপনি কি কিছুক্ষণ অফিসে থাকবেন না চলে যাবেন?

আছি কিছুক্ষণ।

আপনার শরীর কেমন?

ভালো। বেশ ভালো।

জাহানারা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, স্যার আপনি কি একদিন আমাদের বাসায় আসবেন?

আসব। অবশ্যই আসব।

জাহানারা মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এর আগেও এই মানুষটিকে সে কয়েকবার তাদের বাসায় যেতে বলেছে। প্রতিবারেই মনজুরের উত্তর ছিল–যাব। অবশ্যই যাব। কোন যাব না? অথচ কোনো বারই জিজ্ঞেস করে নি–ঠিকানা কী? এবারো জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে উনি যাবেন না। কোনোদিনও না।

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

জিজ্ঞেস কর।

অফিসে সবাই বলাবলি করছে আপনার চাকরি নেই। কথাটা কি সত্যি?

জানি না। সত্যি হতেও পারে।

আপনি বড় সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?

না। তবে সত্যি হওয়া সম্ভব–অনেকদিন ধরেই দেখছি আমার টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অফিসে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছি। আমাকে ছাড়াই সব কাজ চলছে এবং খুব ভালোভাবে চলছে। আমাদের বড় সাহেবকে আমি খুব ভাল করে চিনি। সে কখনো

অপ্রয়োজনীয় মানুষজন রাখবে না। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও না। ফার্মকে বড় করতে হলে কিছু কঠিন নিয়মকানুনের দরকার হয়।

মনজুর নিজের অফিসে ঢুকে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে কোনো ফাইলপত্র নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়। মনজুর ইজিচেয়ারে কত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহানারা পেছনে পেছনে আসছিল। ঘুমন্ত মনজুরকে দেখে তার মনটা অসম্ভব খারাপ হলো। কী অসুস্থ একটা মানুষ! শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথা কাত হয়ে আছে। কেমন অসহায় ভঙ্গি! একটা বালিশ থাকলে মাথার নিচে দিয়ে দেয়া যেত।

জাহানারা মাছ কুটছিল

জাহানারা মাছ কুটছিল।

ঘরে ছাই নেই। ছোট ছোট মাছ, কুটিতে এমন অসুবিধা হচ্ছে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটা ঠিকা-ঝি আছে; সে মাসের গোড়ায় পলিথিনের ব্যাগে এক ব্যাগ ছাই দিয়ে যায়। এক ব্যাগ ছাইয়ের দাম দুটাকা। এই মাসে তার ছাই রাখা হয় নি। এক ব্যাগ ছাইয়ের জন্যে সে চাইল পাঁচ টাকা। জাহানারা বলল, এক ধাক্কায় আড়াইগুণ দাম বেড়ে গেল, ব্যাপারটা কী?

ঠিকা-ঝি গভীর গলায় বলল–সব জিনিসের দাম বাড়তাছে আফা। আর এই ছাই হইল আসল। আমার কাছে নকলের কারবার নাই।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, ছাইয়ের আবার আসল-নকল কী? যাও নিয়ে যাও—ছাই লাগবে না।

না লাগলে নাই—ধমক দেন ক্যান?

ধমক দিলাম কোথায়? খামাখা তর্ক না করে কাজ শেষ কর।

হিসাব মিটাইয়া দেন আফা–আফনাগো বাড়ি কাম করুম না। আফনেরা মানুষ বালা না।

ঝি চলে গেলে মহা সমস্যা জেনেও জাহানারা হিসাব মিটিয়ে দিল। বুড়ি ছাইয়ের ব্যাগ হাতে মুখ অন্ধকার করে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে পাঁচ টাকা দিয়ে এক ব্যাগ আসল ছাই কেনাই ভালো ছিল। ছাই থাকত, কাজের লোকও থাকত।

দরজার কড়া নড়ছে। জাহানারাকেই উঠতে হবে। ঘরে আর কেউ নেই। মার দাঁতে যন্ত্রণা, ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে মেডিক্যাল কলেজে। দুপুরের আগে ফিরতে পারবে না। এর মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখতে হবে। তারা ফিরে এলে তবেই জাহানারা অফিসে যাবে। সমস্যা হবে না সে বলে এসেছে। তবু খারাপ লাগে।

জাহানারা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার ইচ্ছা করল। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। এরকম অদ্ভুত ইচ্ছার জন্যে পরমুহূর্তেই লজ্জায় প্রায় নীল হয়ে গেল।

মনজুর বলল, তোমাদের বাসা খুঁজতে খুব যন্ত্রণা হয়েছে। এখানে বাসার নাম্বারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেমন আছ জাহানারা?

জ্বি স্যার ভালো।

আসতে বলেছিলে–আসলাম। তোমার মা ভালো আছেন?

জ্বি স্যার আসুন–ভেতরে আসুন।

জাহানারা লক্ষ করল সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। কেন এরকম হচ্ছে? এরকম হচ্ছে কেন?

কোনো সাড়াশব্দ নেই, তুমি কি বাসায় একা?

জ্বি স্যার। আমার মা গেছেন দাঁত তুলতে। ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে। আপনি বসুন।

তোমার মার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অফিসে থাকবে, আমি তোমার মার সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

মা এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

মনজুর বসল। জাহানারার কান্না পাচ্ছে। বসার ঘরটা ফরিদ কী করে রেখেছে! এলোমেলো হয়ে আছে বিছানার চাদর। বসার ঘরে ফরিদের খাট না রাখাই উচিত ছিল। বসার ঘরটা থাকবে সুন্দর, গোছানো।

জাহানারা বিছানার চাদর ঠিক করতে গিয়ে হাতের ময়লায় মাখামাখি করে ফেলল। মাছ কুটিতে কুটতে সে উঠে এসেছে, তার মনেই নেই। হাত ধোয়া হয় নি।

জাহানারা!

জ্বি।

আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্রাস পানি দিতে পারবে?

স্যার, এক্ষুণি আনছি।

ঘরের গ্লাসগুলো এত বাজে! কী ক্ষতি ছিল একটা সুন্দর গ্লাস যদি ঘরে থাকত? রমিজদের বাসা থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আসবে? তার সঙ্গে ফ্রিজের এক বোতল ঠাণ্ডা পানি? ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো? করুক মনে। কিছু যায় আসে না। ভালো চায়ের কাপও একটা আনতে হবে। জাহানারা ঠিক করে ফেলল, এবারের বেতন পেয়ে সে আর কিছু করুক বা না করুক, চমৎকার একটা গ্লাস কিনবে, একটা চায়ের কাপ কিনবে। আচ্ছা, স্যারকে কি সে দুপুরে খেতে বলবে? বললেই কি উনি খাবেন? যদি খেতে রাজি হন-কী দিয়ে সে খাওয়াবে?

জাহানারা বারান্দায় এসে দেখল বিড়াল মহানন্দে মাছ খাচ্ছে। খাক, যা ইচ্ছে করুক। তার ভালো লাগছে না। জ্বর-জুর লাগছে। জাহানারা পাশের বাসা থেকে পানির বোতল এবং গ্লাস আনতে গেল।

ঘরে কিছু নেই। শুধু এক গ্লাস পানি কি কাউকে দেয়া যায়? পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে জাহানারা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, স্যার আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খাবেন?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, ভাত?

খেলে খুব খুশি হব স্যার। আর এর মধ্যে মা এসে যাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভাত খাব। কী রান্না?

জাহানারার মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই তো রান্না নেই। সে কী খাওয়াবে? কেন সে ভাত খাওয়ার কথা বলতে গেল? কেন সে এতবড় বোকামি করল? ফরিদ এলে তাকে রিকশা করে কাচাবাজারে পাঠালে সে কি মাছ-মাংস কিছু আনতে পারবে না? না হয় আজ একটু দেরি করেই খাওয়া হবে।

কী রান্না তা তো বললে না?

এখনো কিছু রান্না হয় নি। স্যার।

তাহলে বরং এক কাজ করি। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ থাক। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

জাহানারার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে, স্যার আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। শুধু একদিন, শুধু এক বার। মানুষ হবার অনেক যন্ত্রণার একটি হচ্ছে–যা বলতে প্রাণ কাঁদে তা কখনো বলা হয় না।

মনজুর বলল, উঠি কেমন? আরেকদিন এসে তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করব।

টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল

টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সব কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। সে কোথায়? অফিসে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা মনে আছে। এখনো কি অফিসেই ঘুমাচ্ছে? তাকে রেখে অফিস বন্ধ করে সবাই চলে গেছে? না, তা কেমন করে হয়? চারদিক অন্ধকার। অফিস এত অন্ধকার হবে না। আরো এ তো তার নিজের বিছানা! সে বাসায় কখন ফিরল? টেলিফোন বেজেই চলছে। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই ভৌতিক কোনো ব্যাপার। ঐ ছেলেটিই বোধহয় টেলিফোন করছে— 'ভিমরুল'। একমাত্র ঐ ছেলেটিই টেলিফোন করে তাকে পায়। আর কেউ পায় না।

মনজুর আধো ঘুম আধো জাগরণে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলল, হ্যালো ভিমরুল?

ওপাশ থেকে অভিমানী গলা শোনা গেলা–আপনি আমাকে ভিমরুল বলছেন কেন?

ঠাট্টা করছি। তোমাকে খ্যাপাচ্ছি।

আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।

খুব বেশি রাগ লাগছে?

হ্যাঁ।

খুব বেশি রাগ হলে তুমি কী কর?

কিছু করি না।

কাঁদো না?

না। আমি তো ছেলে। ছেলেদের কাঁদতে নেই।

তা তো বটেই–আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন ছেলে হয়েও খুব কাঁদতাম। তারপর হঠাৎ একদিন কান্না বন্ধ করে দিলাম।

কেন?

সেটা এক মজার গল্প। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা, আমি আর একটা কাজের ছেলে–এই তিনজন থাকি। বাবা খুব কঠিন মানুষ। কথায় কথায় শাস্তি দেন। একবার কী অন্যায় যেন করেছি। বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন–বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কী হলো জান? তিনি আমার কথা ভুলে গেলেন। চলে গেলেন বাইরে। সেই রাতে আর ফিরলেন না। আমি সারারাত অন্ধকার বাথরুমে আটকা পড়ে রইলাম।

কাজের ছেলে আপনার খোঁজ করল না?

না। সে ভেবেছিল আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছি।

আপনি কান্নাকাটি করলেন না? চিৎকার করলেন না?

প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম তারপর কান্না বন্ধ করে দিলাম। পরদিন ভোরে বাবা এসে বাথরুমের দরজা খুলে আমাকে বের করলেন।

উনি তখন কী করলেন?

সেটা আমি তোমাকে বলব না–এ-কী ভিমরুল তুমি কাঁদছ নাকি?

না।

আমি যেন ফুপিয়ে কাদার শব্দ শুনলাম।

কাঁদলে কী?

কিছুই না–নাথিং...

ওপাশের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন পুরোপুরি ডেড। মনজুর উঠে বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল–রাত দুটো। রাত দুটার সময় ইমরুল নিশ্চয় তাকে টেলিফোন করে নি। পুরো ব্যাপারটিই কি তার কল্পনা? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

মনজুর বাথরুমের দিকে রওনা হলো।

বাথরুম সেরে গরম এক কাপ চা খাবে। চিনি, দুধ সবই কেনা আছে। চিনি সে রেখেছে ‘সমুদ্র’ নামের কোটায়। এটা ঠিক হয় নি। সমুদ্র নামের কোটায় রাখা উচিত ছিল লবণ– চিনি নয়। আমরা সব সময় যাকে যেখানে রাখার কথা সেখানে না রেখে ভুল জায়গায় রাখি।

আপনার কিছু লাগবে?

মনজুর চমকে তাকাল। পনের-ষোল বছরের লাজুক ছেলেটিকে সে চিনতে পারল না। সে কে? এখানে এলইবা কোত্থেকে?

তুমি কে?

স্যার আমার নাম ফরিদ।

ফরিদ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

আমি জাহানারা আপার ছোট ভাই।

ও আচ্ছা আচ্ছা। জাহানারা তোমাকে এখানে পোস্টিং দিয়ে গেছে?ত

জ্বি।

মেয়েটা তো বড় যন্ত্রণা করছে।

ফরিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মনজুর বলল, আমার এই কথায় তুমি কি মন খারাপ করলে?

জ্বি না স্যার।

স্যার বলছ কেন? আমি তো তোমার স্যার না। তুমি কী পড়?

এইবার এসএসসি দেব।

সায়েন্স না। আর্টস?

কমার্স। আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ।

তুমি কি চা বানাতে পার?

জ্বি না।

শুধু পড়াশোনায় না, তুমি তো মনে হচ্ছে কাজকর্মেও খারাপ। পানি গরম করতে পার?

জ্বি পারি।

ভেরি গুড। পানি গরম কর। আমি বাথরুম থেকে এসেই চা বানাব এবং তোমাকে চা বানানো শিখিয়ে দেব।

ফরিদ হেসে ফেলল।

রাত আড়াইটা।

দুজন নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়ে সহজ গলায় বলল, ফরিদ সিগারেট খাবে নাকি?

ফরিদ চমকে উঠল।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, অল্পবয়স্কদের সিগারেট সাধা হচ্ছে আমার সস্তা ধরনের রসিকতার একটি। এই রসিকতা করে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম শোন। ক্লাস টুতে পড়ে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম–খোকা সিগারেট খাবে? সে গম্ভীর গলায় বলল, জ্বি খাব। দিন একটা।

মনজুর খুব হাসতে লাগল।

হাসছে ফরিদও। প্রথম দিন এই মানুষটিকে খুব খারাপ লেগেছিল। আজ লাগছে না। আজ ভালো লাগছে।

ফরিদ।

জ্বি।

আমি একটা ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলাম। তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ?

জ্বি না।

তুমি কি জেগে ছিলে?

জ্বি জেগে ছিলাম। নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

তুমি যদি জেগে থেকে কিছু না শুনে থাক তাহলে ধরে নিতে হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি একটা কাজ কর-আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস কর। দেখি বলতে পারি। কিনা। পাগলেরা ধাঁধার উত্তর পারে না।

ফরিদ বলল, আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার বিশ্রাম দরকার।

এখন আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। বিশ্রামের কোনোই দরকার নেই। এস দুজন বারান্দায় বসে থাকি।

আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।

তা লাগবে। লাগুক না। চল–ভোর হওয়া দেখি।

ভোর হতে এখনো অনেক দেরি।

মোটেই দেরি নয় ফরিদ সাহেব। সময় অত্যন্ত দ্রুত যায়। আমরা জীবন শুরু করি, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি–সময় শেষ–দুয়ারে পাল্কি এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা

আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা।

জালালউদ্দিন গাড়ি রেখে গেছেন। প্রথম দিন সে গাড়ি করে যাক। মীরা বলেছে গাড়ি লাগবে না। তবু খুশিই হয়েছে। গাড়ি সে ছেড়ে দেবে না। শুরুর দিনটিতে তারা নিশ্চয়ই তাকে সারাদিনের জন্যে রেখে দেবে না। কাজটাজ খানিকটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে–বাসায় চলে যান। প্রথম দিনেই এত কাজের দরকার নেই। সে তখন গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরবে। বিশেষ কোথাও যাবে না। এমনি ঘুরবে। গুলশান মার্কেট যেতে পারে। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা যেতে পারে। বিছানার চাদর কেনা মীরার হবি বিশেষ। কত ধরনের চাদর যে তার আছে–তারপরেও কেনা চাই।

কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, আফা আপনার কাছে আইছে।

কে এসেছে?

কাজের মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। যার মানে যে এসেছে তার পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে এবং কিঞ্চিৎ হাসি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনজুর। মীরা কঠিন গলায় বলল, হাসছ কেন?

হাসি থেমে গেল। কাজের মেয়েটি এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। মীরা এমন কঠিন করে কথা বলবে তা হয়তো সে ভাবে নি। মীরা শীতল গলায় বলল, উনি যদি আসেন কখনো এমন করে হাসবে না, যাও দুকাপ চা দিতে বল।

আটটা চল্লিশ বাজে। এখনো অনেক সময় আছে। দশটা বাজার পনের মিনিট আগে রওনা হলেই হবে। মীরা আয়নার দিকে তাকাল। চুল বাধা হয় নি। এইভাবেই কি যাবে, না চুল বাধবে? শাড়িটাও গুছিয়ে পরা নেই। একটু কি গুছিয়ে পরা উচিত না? সে চিরুনি হাতে নিয়ে দ্রুত চুলের উপর টানতে লাগল।

আশ্চর্য! মীরাকে ঢুকতে দেখে মনজুর উঠে দাঁড়াল। বাইরের একজন মহিলাকে সে যেন সম্মান দেখাচ্ছে। কোনো মানে হয়? মীরা বলল, কেমন আছ?

ভালো।

কী রকম ভালো সেটা শুনি।

মোটামুটি ভালো। চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন পারব জানি না।

তোমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনেছি। সরি, দেখতে যেতে পারি নি। হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না। বাবা একবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। দশ দিন ছিলেন। আমি দেখতে যাই নি। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

মনজুর হেসে বলল, কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? আমি কি কৈফিয়ত তলব করতে এসেছি?

কী জন্যে এসেছ?

তোমার অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে রয়ে গেছে—ঐসব কী করবে তাই জানতে এসেছি।

থাকুক। তোমার ওখানে। এক সময় নিয়ে আসব।

আমি এখন কিছুদিন মেজো মামার সঙ্গে থাকব। তোমার জিনিসপত্র আবার নষ্ট না হয়।

নষ্ট হলে হবে, কী-বা আছে!

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, বাস চা আসছে। তুমি যাবে কোথায়–অফিসে?

হ্যাঁ।

আমি নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। সাড়ে নটার সময় আমি বের হব। চলবে তো?

চলবে।

কাজের মেয়েটি চা নিয়ে ঢুকেছে। শুধুই দুকাপ চা, সঙ্গে কিছুই নেই। সামান্য ভদ্রতাটুকুও কি এরা এই মানুষটাকে দেখাবে না?

নাও চা খাও। চিনি হয়েছে?

হয়েছে।

আমি এর মধ্যে তোমার খোঁজ নেয়ার জন্য তোমাদের অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। তুমি ছিলে না। অফিসের এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি আজকাল অফিসে খুব কম আসে। তোমার শরীর কি বেশি খারাপ?

শরীর খুব বেশি খারাপ না। অফিসে যাই না। কারণ মনে হচ্ছে আমার চাকরিটা নেই।

কী বলছ তুমি!

এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে এদের ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হচ্ছে।

তুমি ভালোমতো জানতেও চাও নি?

না।

কেন না–সেটা আমাকে গুছিয়ে বল।

আমার ইচ্ছা করছিল না। যা হবার হবে।

তুমি গা এলিয়ে পড়ে থাকবে?

সব সময় তো তাই করেছি।

এটা কি কোনো বাহাদুরি?

মনজুর কিছু বলল না। মনে হয় একটু হাসল। মীরা রাগী গলায় বলল, তুমি এমনভাবে কথা বলছি যেন গা এলিয়ে পড়ে থাকা খুব অহঙ্কারের ব্যাপার। যেন তুমি মস্ত কাজ করে ফেলাছ।

রেগে যাচ্ছ কেন মীরা?

রাগের কাণ্ড করছ, তাই রেগে যাচ্ছি। এই ফার্ম দাঁড় করাবার পেছনে তোমার কনট্রিবিউশন আমি কি জানি না? তুমি কখনো বল নি, তোমার বচস বলেছে। আর সে তোমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে–তুমি কোনো কথা বলবে না?

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে বলল, একেকজন মানুষ একেক রকম হয়। আমি ছোটবেলা থেকেই এরকম। কত বড় বড় ঘটনা ঘটে, প্রথমে খুব হকচকিয়ে যাই, তারপর মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে। কী আর করা।

তুমি তাহলে একজন সাধুপুরুষ? মহামানব?

আরে কী যে বল! তুমি এতদিন পর আজ হঠাৎ এত রাগ করছ, কেন?

জানি না। তোমাকে দেখে কেন জানি খুব রাগ লাগছে। যাও আর রাগ করব না। তুমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আরেক কাপ চা খাও। আমি কাপড় বদলে আসি।

আচ্ছা।

তোমাকে বলা হয় নি। আজ আমি একটা চাকরিতে জয়েন করছি।

বাহ ভালো তো।

সামনের মাসেই নতুন বাসা নেব।

ভেরি গুড। তোমার নতুন বাসার জন্যে কোনো ফার্নিচার দরকার হলে আমাকে বলবে। আমি মামাকে বলে ভালো ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দেব।

থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখন কাপড় বদলাতে যাই। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। চল্লিশ-পয়তাল্লিশ মিনিট।

মীরার এত সময়ও লাগল না। ত্রিশ মিনিটের মাথায় ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল মনজুর সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। দুবার ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, আমার এখন প্রধান সমস্যাই হচ্ছে ক্লান্তি। হেঁটে হেঁটে তোমার এখানে এসেছি তো, ক্লান্ত হয়েছি–ঘুম এসে গেছে। সরি এবাউট ইট।

হেঁটে হেঁটে এলে কেন?

রিকশায় ওঠা আমার জন্যে বিরাট সমস্যা, দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায়। রিকশায় ঘুমিয়ে পড়া বিরাট রিস্কি ব্যাপার।

তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।

মনজুর সহজ গলায় বলল, কিডনি ট্রান্সফার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিডনি সত্যি সত্যি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে?

হুঁ।

কে দিচ্ছে কিডনি?

এখনো ঠিক হয় নি। ডোনার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

কবে দিয়েছ?

তিনদিন হলো। এখানো কেউ আসে নি।

কত টাকা দিচ্ছ ডোনারকে?

একলাখ।

এত টাকা!

একজন তার শরীরের মূল্যবান অংশ দিয়ে দেবে। আর তাকে এক লাখ টাকাও দেব না?

আছে তোমার কাছে এত টাকা?

না। আমার খালা কিছু দিয়েছেন–আর মামাও দিচ্ছেন।

ট্রান্সপ্লেন্টটা হবে কোথায়?

মাদ্রাজে। ভ্যালোর। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

যোগাযোগটা করছে কে? তুমি নিশ্চয়ই না।

মামাই সব দেখাশোনা করছেন।

তোমার তো অনেক টাকা লাগবে।

তা লাগবে।

আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমি কিছু দিতে পারি। পরে ফেরত দিয়ে দিও।

মনজুর কথা বলল না।

গাড়িতে সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে গেল।

মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ওখানে বসছ কেন? পেছনে আসা। মনজুর বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনে মীরার সঙ্গে বসল।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে বসতে অস্বস্তি বোধ করছ নাকি?

না–অস্বস্তি বোধ করার কী আছে?

কিছুই নেই। কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে। আরাম করে বস। আবার যেন ঘুমিয়ে যেও না।

না এখন আর ঘুমাব না–তোমাদের বাসায় সোফায় ভালো ঘুম হয়েছে।

তুমি এখন তাহলে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছ?

হুঁ। অসুখটা মনে হয় আমাকে কাবু করে ফেলছে।

অসুখ ছাড়াও তো তুমি ভালো ঘুমাতে। বাসর রাতে কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলে মনে আছে?

মনে আছে। এক ঘুমে রাত কাবার।

দ্বিতীয়বার যদি বিয়ে কর–তাহলে এই ভুল করবে না।

না—তা করব না।

মীরা মনজুরকে তাঁর অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

মনজুর কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। মানুষটা এত অসুস্থ!

মনজুর লিফটে করে উঠার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করল।

অফিসের দুজন কর্মচারীও তার সঙ্গে উঠছে। তারা সালাম দিল না। এমন কোনো বড় ব্যাপার না। কিন্তু চোখে লাগে। মনজুর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কী ভালো? ওরা দুজনেই লজ্জা পেল বলে মনে হলো। একজন বলল, জ্বি ভালো। তবে সে স্যার বলল না। মনে হচ্ছে এখন কেউ আর তাকে স্যার বলায় আগ্রহী নয়। নিচের অফিসারদের কেউই উঠে দাঁড়ায় না। তাকে সম্মান দেখানোর প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে। চিফ অ্যাকাউনটেন্ট সেদিন হঠাৎ কী মনে করে তার ঘরে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মনজুর তার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারল না। মনে হলো গল্প-গুজব করতেই এসেছেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন। শরীরের খোঁজখবর করলেন। এক সময় বললেন, মনজুর সাহেব, আপনার এই ঘরের সাইজ কত? তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ভদ্রলোক মনজুরের ছেড়ে যাওয়া কামরায় এসে উঠতে চান। ঘরের মাপে কার্পেট কিনতে হবে। মনজুর বলল, ঘরের মাপ তো জানি না। একটা গজ-ফিতা দিয়ে মেপে ফেললে হয়। মাপাব?

না থা।

জানতে চাচ্ছেন কেন?

এমনি প্রশ্নটা মনে আসল। আমার ঘর আবার সাইজে খুবই ছোট। আপনার ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশনের সুবিধা আছে।

এই ঘরে আসতে চান?

সরাসরি প্রশ্নে চীফ অ্যাকাউনটেন্ট নার্ভাস হয়ে গেলেন।

থতমত খাওয়া গলায় বললেন, আরে না। আপনার ঘরে আপনি আছেন। আমি আসব। কী করে?

আমি তো নাও থাকতে পারি।

যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই মনজুর সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবেন এবং মনে সাহস রাখবেন। সব ওষুধের সেরা ওষুধ হলো মনের জোর।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই কুদ্দুসকে ডাকিয়ে মনজুর কামরা মাপাল। কাগজে সেই মাপ লিখে পাঠিয়ে দিল চিফ অ্যাকাউনটেন্টকে। ভদ্রলোককে খানিকটা লজ্জায় ফেলা হলো। মাঝে মাঝে মানুষকে লজ্জা দিতে খারাপ লাগে না। অবশ্যি একদল মানুষ আছেন যারা কখনো লজ্জা পান না। চিফ অ্যাকাউনটেন্ট সেই রকম একজন মানুষ।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। আজকাল অতি অল্পতেই শরীর ভেঙে আসে। মনে হচ্ছে আরেকবার ডায়ালাইসিস করিয়ে রক্তের ভেতর থেকে দূষিত জিনিসগুলি বের করে দিতে হবে। হাঁটাহাটি, ঘোরাফেরা বন্ধ করে হাসপাতালের বিছানায় ফিরে যেতে হবে।

মনজুর ডিভানে বসল। ডিভানের এক মাথায় ছোট্ট একটা বালিশ। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। মেয়েটা তার সেবাযত্নের নানান চেষ্টা করছে। কোনো কিছুতেই তার মন ভরছে না।

গতকাল তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, স্যার কয়েকটা দিন আমাদের বাসায় এসে থাকবেন? বলেই সে এমন লজ্জা পেল যে মনজুর এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মনে হলো প্রসঙ্গ পাল্টানোয় জাহানারা স্বস্তি পেয়েছে।

আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে কুদ্দুস মাথা ঢুকিয়ে বলল, বড় সাব আফনেরে ডাকে। বিশেষ দরকার।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের ইচ্ছে করছে বলতে-বড় সাহেবকে এইখানে আসতে বল। আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই। তা বলা সম্ভব নয়।

নুরুল আফসার এই ভোরেই মদ্যপান করেছেন।

ঘরময় এলকোহল এবং সিগারেটের কটু গন্ধ। এয়ারকুলার চলছে। এয়ারকুলার থেকে পাতলা ধাতব আওয়াজ আসছে যা সূক্ষ্মভাবে মাথার উপর চাপ ফেলে। এক সময় মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করে।

নুরুল আফসার টেবিলে পা তুলে আধশোয়া হয়ে আছেন। মনজুরের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুই আছিস কেমন?

ভালো।

তোকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেয়ার জন্যে ডাকিয়েছি।

কী কমপ্লিমেন্ট?

পৃথিবীতে নির্লোভ মানুষ আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। তুই প্রমাণ করেছিস যে আছে। তুই কি ছোটবেলা থেকেই এমন, না বড় হয়ে হয়েছিস?

ছোটবেলায় আমি বিরাট চোর ছিলাম।

নুরুল আফসার আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুরের কথায় তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন।

তুই ছোটবেলায় চোর ছিলি?

হুঁ।

কী চুরি করতি?

খালার বিছানার নিচ থেকে ভাংতি পয়সা সরাতাম।

রেগুলার সরাতি?

হুঁ। পরে জানতে পারলাম আমি যাতে পয়সা চুরি করতে পারি সে জন্যেই খালা সব সময় তোশকের নিচে ভাংতি পয়সা রাখতেন; কারণ এমনিতে আমি কখনো টাকা পয়সা নিতাম না। হাজার সাধাসাধিতেও না।

তোর খালাও মনে হচ্ছে তোর মতোই ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

খালা একজন চমৎকার মানুষ। তোর কথা কি শেষ হয়েছে? আমি এখন ডিভানে শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কথা শেষ হয় নি। আসল কথা, এবং সবচে' ইম্পটেন্ট কথাটাই বাকি।

যদি সম্ভব হয় তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

নুরুল আফসার টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এই ফার্মটা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। তুই আমার পাশে দাঁড়িয়ে গাধার মতো খেটেছিস। মনে আছে?

আছে।

তোকে অনেকবার বলছিলাম আমাকে তুই দাঁড় করিয়ে দেন; তোকে আমি ঠকাব না। কি কি মনে আছে?

আছে।

তুই তোর কথা রেখেছিস–আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিস। আমি আমার কথা রাখতে চাই। তুই কি লক্ষ করেছিস পে-স্লিপে তোর নাম নেই?

লক্ষ করেছি।

কেন নেই এ নিয়ে তোর মনে প্রশ্ন ওঠে নি?

উঠলেও খুব মাথা ঘামাই নি।

আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে পারি। আবার নাও আসতে পারি। এই ফার্মের মালিকানার একান্ন ভাগ তোকে দিয়ে যাচ্ছি। বাকি উনপঞ্চাশ ভাগ থাকবে আমার। পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে তোর হাতে। তের হাজার মাইল দূর থেকে আমি সুতা নাড়ব না। অনেস্ট।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

সে খুশি হলো না অখুশি হলো তাও বোঝা গেল না। বড় বড় ঘটনা তার উপর কোনোই প্রভাব ফেলে না। তার চোখ ছোট ছোট। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার জন্যে তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

নুরুল আফসার বললেন, মনজুর, কোম্পানির এসেটস যেমন আছে–লায়াবিলিটিসও আছে। আমাদের ব্যাংক-লোন আছে দু কোটি টাকার উপর। সব কিছু মাথায় রাখতে হবে। কিছু ডিসঅনেস্ট কর্মচারী আমাদের আছে। ডিসঅনেষ্ট হলেও তারা খুব এফিসিয়েন্ট। এদের

কখনো হাতছাড়া করবি না। আবার কখনো এদের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবি না। তুই কি ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি?

না।

তুই তোর ঘরে গিয়ে বস। কাগজপত্র পাঠাচ্ছি। অনেক কাগজে সিগনেচার করতে হবে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে খবরটা ছড়িয়ে গেছে, অফিসের সবাই এখন জানে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কেমন অন্যরকম করে তাকাচ্ছে। মনজুরের ঘরে যাবার পথ মূল অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। মূল অফিসে পা দেয়ামাত্র সবার কাজকর্ম থেমে গেল। তাদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকে ডিভানে গা এলিয়ে দিল। খুব তৃষ্ণা লাগছে। অথচ উঠে পানির বোতলের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা একগাদা কাগজ হাতে ঢুকেছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, বড় সাহেব পাঠিয়েছেন– সই করতে হবে স্যার।

কলম আছে তোমার কাছে?

জ্বি আছে।

দস্তখত করতে করতে মনজুর বলল, তুমি কাঁদাছ কেন জাহানারা?

জাহানারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকে একটু পরপর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারছে না। কী যে আনন্দ হচ্ছে! কেন এত আনন্দ? কেন?

জাহানারা আজ বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা জিনিস কিনল। একটা গ্লাস, সুন্দর একটা চায়ের কাপ, ভালো একটা চিনামাটির প্লেট। জাহানারার মা অবাক হয়ে বললেন, সব জিনিস একটা একটা করে কেন রে মা?

জাহানারা বিব্রত গলায় বলল, আমার কি টাকা আছে? ধীরে ধীরে কিনব। জিনিসগুলো সুন্দর হয়েছে না। মা?

হ্যাঁ সুন্দর। পরে কি তুই সেট মিলিয়ে কিনতে পারবি?

পারব।

জাহানারা মুখে বলল–পারবে, কিন্তু সে ঠিক করে রেখেছে সেট মিলিয়ে সে কিনবে না। এই জিনিসগুলো তার কাছে একটা করেই থাকবে।

দরজার কড়া নড়ছে

দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর বড় বিরক্ত হলো। এত ভোরে কে এল? ইদানীং সবাই মিলে তাকে খুব বিরক্ত করছে। অফিসের লোকজন আসছে–কখনো একা, কখনো দল বেঁধে। একবার এলে আর যেতে চাচ্ছে না। সেদিন করিম সাহেব এলেন, সঙ্গে নীল রঙের একটা বোতল। এই বোতলে হালুয়াঘাটের এক পীর সাহেবের পানি-পড়া আছে। এই বস্তু জোগাড় করতে তাকে যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে। সে গল্প এক ঘণ্টা ধরে করলেন। গল্প শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পানি-পড়া জোগাড় করার চেয়ে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে আসা অনেক সহজ।

গতকাল এসেছিলেন বাসারত সাহেব, একা আসেন নি— নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামে একজন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। ছোটখাটো মানুষ হলেও নিত্যানন্দবাবু একাধারে কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, জ্ঞানশ্রী এবং বিদ্যাশ্রী। ভদ্রলোক মনজুরের নাড়ি ধরে ঝাড়া পয়তাল্লিশ মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। পয়তাল্লিশ মিনিট পর মনজুর বলল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভাই?

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বললেন এবং আরো দশ মিনিট এভাবেই কেটে গেল। মনজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, একী যন্ত্রণা!

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী চোখ মেলে বললেন, আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। ওষুধটার নাম 'নালাদি ক্বাথ।' নল, কুশ, কাশ এবং ইক্ষু এই চার উপাদানে নির্মিত। ওষুধটা এক মাস ব্যবহার করুন। তারপর এই যুগের বড় বড় ডাক্তারদের কাছে যান। তারা বলবে– কিডনি ঠিক আছে। যদি তা না বলে আমি আমার সংগ্রহে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে শতাধিক পুস্তক আছে সব পুড়িয়ে ছাই বানাব। সেই ছাই মুখে লেপন করে আপনাকে দেখিয়ে যাব।

মনজুর বলল, কত লাগবে ওষুধ তৈরি করতে?

বাসারত সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। কী লাগবে না-লাগবে তা আমি দেখব।

বেশ দেখুন।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তখন তার চিকিৎসার গল্প শুরু করলেন। এক এমআরসিপি ডাক্তার কীভাবে তার কাছে ছুটে এসে করজোড়ে বলেছিলেন।— নিত্যবাবু, আপনার মতো কিন্তু আমার জীবনে দেখি নি। আপনি বয়োকনিষ্ঠ, নয়তো আপনার পায়ের ধূলা নিতাম।

মনজুর তাদেরকে জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল। নিত্যবাবু এবং বাসারত দুজনের কেউই যাবার নামটি মুখে আনছিল না।

আজ সেই নিত্যবাবুই এসেছেন মনে হচ্ছে। চারদিন পর তাঁর ওষুধ দিয়ে যাবার কথা– 'নালাদি ক্বাথ।' চারদিন পার হয়েছে। আজ পঞ্চম দিন।

মনজুর উঠে দরজা খুলল। এই ভোরবেলায় জাহানারা চলে এসেছে। তার শরীর হলুদ রঙের চাদরে ঢাকা।

চাদরে পুরোপুরি শীত মানছে বলে মনে হচ্ছে না। অল্প অল্প কাঁপছে। জাহানারার হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের একটি বাটি।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। সূর্য ওঠার আগে চলে এসেছ, ব্যাপার কী?

আপনি কেমন আছেন?

ভালোই আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে— নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামের এক লোক আমাকে 'নালাদি ক্বাথ' দিয়ে যাবে। ঐ বস্তু খাওয়ার পর শরীর আরো ভালো হয়ে যাবে। কিডনি যেটা নষ্ট সেটা তো ঠিক হবেই–অন্য যেটা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেটাও সম্ভবত গজাবে। এস ভেতরে এস। টিফিন বক্সে কী?

ভাপা পিঠা। মা করে দিয়েছেন স্যার।

ভেরি গুড। চল ভাপা পিঠা খাওয়া যাক। আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি–তুমি ততক্ষণে চায়ের পানি বসিয়ে দাও। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো নিত্যবাবুর জালে আটকা পড়ে যেতে হবে।

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল।

তার মুখ মলিন। রাতে সে এক ফোটা ঘুমাতে পারে নি। পুরো রাত ছটফট করেছে। শেষরাতের দিকে বারান্দায় এসে বসেছে। বারান্দার কোনায় জাহানারার মাও বসে। ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ডাকলেন, এদিকে আয় মা। জাহানারা মার কাছে গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি বললেন, তোর কী হয়েছে তুই আমাকে বল তো মা।

জাহানারা বলল, কিছুই হয় নি।

অনেক দিন থেকেই দেখছি।–তুই ছটফট করছিস। আমাকে বল তো মা, তোর কী হয়েছে?

জাহানারা তীব্র গলায় বলল, বললাম তো কিছু হয় নি।

সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। জাহানারার মা তার পেছনে পেছনে ঢুকলেন এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তাঁর মেয়ে বিছানায় শুয়ে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। বাকি রাতটা বিছানার পাশে চুপচাপ বসে কাটালেন। মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার সাহসও তাঁর হলো না।

স্যার দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কিনা?

মনজুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে। তুমি চা খাচ্ছো না?

জ্বি না। আমি খালিপেটে চা খেতে পারি না।

খালিপেটে খেতে হবে কেন? পিঠা তো আছে। পিঠা নাও।

এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মৃদু গলায় বলল, আপনাকে একটা কথা বলার জন্যে আমি এত ভোরে এসেছি। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

বল।

স্যার আপনি কিডনি চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা কিডনি দিতে চাই।

মনজুর বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি একেক সময় একেকভাবে কথা বলে। আজ সম্পূর্ণ অন্য রকমভাবে কথা বলছে।

তুমি কিডনি দিতে চাও?

জ্বি।

কেন বল তো?

জাহানারা জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা যে আজ কথা অন্যভাবে বলছে তাই না–তাকে দেখাচ্ছেও অন্য রকম। মনজুর বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।

জাহানারা বসল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনজুর বলল, তুমি কিডনি দিতে চাইলেই তো হবে না। ক্রস ম্যাচিঙের ব্যাপার আছে।

ক্রস ম্যাচিঙের অসুবিধা হবে না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আপনার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তিনি বলেছেন—ঠিক আছে।

মনজুর অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি একবার তোমাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। তুমি কি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছে?

না। সেসব কিছু না।

তাহলে কী?

জাহানারা জবাব দিল না। তবে তীক্ষ্ণ চাোখে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

মনজুর বলল, দেখ জাহানারা, আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নগদ টাকা দিয়ে আমি কিডনি কিনব।

আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে না স্যার।

আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যাও, তুমি বাসায় যাও।

জাহানারা একটি কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সে একটা রিকশা নিয়েছে। চাদরে মুখ ঢেকে সারাপথ ফুঁপাতে ফুঁপাতে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। রিকশাওয়ালা এক সময় বলল, আম্মা কাইন্দেন না। মনডা শান্ত করেন।

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি

বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি।

বদরুল আলম সাহেব পাঁচ জনের ভেতর থেকে চারজনকে ইন্টারভ্যুতে ডেকেছেন। পঞ্চম জন বাদ পড়েছে। বাদ পড়ার কারণ তার নাম ডেরেন কুইয়া। ডেরেন কুইয়া নামের কাউকে ইন্টারভ্যু নেয়ার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। নিশ্চয়ই খ্রিষ্টান। মুসলমান বডিতে অন্য ধর্মের মানুষের শরীরের অংশ ফিট করবে না বলেই তাঁর ধারণা। ইন্টারভ্যুতে একজন বাদ পড়ল। কারণ তাকে খুনির মতো দেখাচ্ছিল। যে তিনজন টিকে গেল তাদের ভেতর থেকে ডাক্তাররা একজনকে বেছে নিলেন। ক্রস ম্যাচিঙে তারটাই নাকি সবচে' ভালো মেলে। ছেলেটির নাম আমানুল্লাহ্ খান। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। রোগা, শ্যামলা এবং বেশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে শুনে সে মনে হলো খানিকটা ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালেই বদরুল আলম সাহেবকে বলল, স্যার, ভয়-ভয় লাগছে।

বদরুল আলম ধমকে উঠলেন, ভয়ের কী?

অপারেশনে মরে টরে যদি যাই!

এইসব অপারেশনে কেউ মরে না। কিডনি কেটে বাদ দেয়া হলো ডাল-ভাত অপারেশন। ডাক্তার লাগে না, এক্সপেরিয়েনস্‌ড নার্সও করে ফেলতে পারে। তোমারটা তো নার্স করবে না। ভ্যালোরের বড় বড় ডাক্তাররা করবেন।

তবু ভয় লাগছে।

বদরুল আলম গভীর মুখে বললেন, তার মানে কী দাঁড়ায়? তুমি রাজি না? রাজি না থাকলে বল, আমাদের হাতে অন্য ক্যানডিডেট আছে। ওরা এক পায়ে খাড়া।

তাঁর হাতে অন্য কেউই নেই। এইসব বলার কারণ আমানুল্লাহকে জানিয়ে দেয়া যে সে সবোধন নীলমণি নয়। এতে টাকা পয়সা নিয়ে দরদাম করারও সুযোগ থাকে। নয়তো আকাশছোয়া টাকা হেঁকে বসবে।

বদরুল আলম বললেন, কথা পাকাপাকি হওয়ার আগে টাকা পয়সার ব্যাপারটা সেটল হওয়া উচিত। কত চাও তুমি?

আমানুল্লাহ্ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বদরুল আলম বললেন, তোমার ডিমান্ড কী আগে শুনি, তারপর আমাদেব কথা আমরা বলব। পছন্দ হলে ভালো কথা। পছন্দ না হলে কিছু করার নাই। আসসালামু আলায়কুম বলে বিদায় করে দিতে হবে। বল কী তোমার দাবি?

আমানুল্লাহ বলল, আপনারটাই আগে শুনি। আপনি কত দিতে চান?

আমার নিজের হলে বিশ হাজারের বেশি একটা পয়সা দিতাম না। দশ হাজারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায়–সেখানে কুড়ি। ডাবল দেয়া। তবে আমার ভাগ্নে বলে দিয়েছে–এক লাখ। এক লাখই দেয়া হবে। এক পয়সা কমও না। এক পয়সা বেশিও না।

টাকাটা দেবেন। কীভাবে?

কীভাবে মানে? ক্যাশ পেমেন্ট হবে, তবে একটা কিন্তু আছে।

কিন্তুটা কী?

পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আগে দেয়া হবে। এটাকে তুমি বুকিং মানি বলতে পারো। বাকি পঁচানব্বুই দেয়া হবে কার্য সমাধা হবার পর।

পুরো টাকাটা আগে দেবেন না?

না।

না কেন? যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?

হ্যাঁ। অসম্ভব কিছু না। এতগুলো টাকা।

আমানুল্লাহ বলল, উল্টাও তো হতে পারে। আমি কিডনি দিয়ে দিলাম তারপর আপনারা আর টাকা দিলেন না।

কী যে তুমি বল। স্ট্যাম্পের উপর দলিল করা থাকবে।

টাকা না দিলে কে আর কোর্ট-কাছারি করবে বলুন! তাছাড়া অপারেশন টেবিলে মরেও তো যেতে পারি। তখন টাকাটা দেবেন। কাকে?

খোদা না খাস্তা সে রকম কিছু হলে তোমার আত্মীয়স্বজন পাবে।

আত্মীয়স্বজনদের জন্যে তো আমার টাকাটা দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনদের আমি কিছু জানাতে চাই না। তারা কিছু জানবেও না।

কাউকে জানাতে চাও না? জ্বি না। শুধু একটা জিনিসই আমি চাই-পুরো টাকাটা এডভান্স চাই। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব না।

আমানুল্লাহ যে ভদ্রলোকের ছেলে সে খোঁজও বদরুল আলম নিলেন। তার বাবা একটা স্কুলের হেডমাস্টার। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমানুল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ। বড় এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ভাই টাঙ্গাইল কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। আমানুল্লাহ নিজেও এ বছর বি.এ পরীক্ষা দিয়েছে।

বদরুল আলম বললেন, টাকাটা তুমি কাকে দেবে?

আমানুল্লাহ ঠাণ্ডা গলায় বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার যে জিনিসটা দরকার তা হলো আমার একটা কিডনি। আর কিছু না। আপনি যদি নগদ টাকা দেন–কিডনি আপনি পাবেন।

বদরুল আলম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটাকে যতটা সরল সাদাসিধা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা সে না, ত্যাঁদড় আছে।

আমানুল্লাহ বলল, আপনি যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে আমাকে খবর দেবেন। তবে আমার বাড়িতে আপনি কিছু বলবেন না। আরেকটা কথা, ভ্যালোর যেতে হলে আমাকে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কীভাবে করতে হয় তাও আমি জানি না। ঐ ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বদরুল আলম বললেন, পাসপোর্ট কোনো ব্যাপারই না। এক ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। আসল সমস্যা টাকাটা। আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি। সে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

আপনি উনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি নিজেই কথা বলব। তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমরা মনজুরকে এর বাইরে রাখতে চাই। সে রোগী মানুষ।

উনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাকে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেব। আর তার সঙ্গে আগে কথা বলব না তা তো হয় না। আগে তাকে আমার পছন্দ হতে হবে।

পছন্দ না হলে কিডনি দেবে না?

দেব। পছন্দ না হলেও দেব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।

বদরুল আলম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনজুরের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তার হাতে দিলেন। দিয়েই বুঝলেন বিরাট ভুল করা হয়েছে। মনজুর এক কথায় টাকা দিবে। একটা হাতে লেখা রসিদও রাখবে না। মনজুর হচ্ছে তার ভাষায় বুদ্ধিমান গাধা-মানব। যথেষ্ট বুদ্ধি,

যথেষ্ট চিন্তাশক্তি; কিন্তু কাজকর্ম গাধার মতো। ছেলেটিকে ঠিকানা দেয়া উচিত হয় নি। না দিয়েই বা কী করা?

থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের মালিকানা বদল

থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের মালিকানা বদলে তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। তবে সবাইকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হলো। প্রধান ব্যক্তির প্রতি আস্থার অভাব থাকলে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। উড়া-উড়া খবর পাওয়া গেল অনেকের চাকরি চলে যাবে। নতুন স্টাফ আসবে। কোম্পানির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। কিছু গুজব নিয়ে কানাঘুষা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচে' আতঙ্কজনক গুজব হচ্ছে–বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় সাহেব তিন কোটি টাকা নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। কোম্পানির লিকুইড প্রপার্টি বলতে কিছুই নেই। ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনই হবে না। এই গুজব বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়েছে। উপরের মহলের অফিসারও বিশ্বাস করেছেন।

আজ সেই গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সবার বেতন হলো, যাদের ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট ডিউ হয়েছিল, তারা তা পেল। ঈদের বোনাস পাওয়া না গেলেও বলা হলো ঈদের ছুটির আগের দিন দেয়া হবে। যে চাপা উদ্বেগ ও অস্বস্তি সবার মধ্যেই ছিল তা অনেকাংশেই কেটে গেল। দুপুরের দিকে মনজুর ডেকে পাঠাল চিফ অ্যাকাউনট্যান্ট করিম সাহেবকে।

করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন চিন্তিত মুখে। তাকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এ রকম একটি গুজবও খুব ছড়িয়েছে। গুজব অবশ্যি শুরু করেছেন তিনি নিজেই।

মনজুর হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন করিম সাহেব?

জ্বি স্যার ভালো।

বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।

করিম সাহেব বসলেন। মনজুর নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। করিম সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন, সিগারেট নিলেন না।

কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা তো আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। সবার বেতন হবে, ঈদ বোনাস হবে–এগুলো আপনি জানেন–তারপরেও কী করে গুজব ছড়াল যে বেতন বন্ধ?

গুজবের কি স্যার কোনো মা-বাবা আছে?

অবশ্যই আছে। গুজবের মা থাকে, বাবা থাকে এবং গুজবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও থাকে। গুজবটা আপনার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটাই দুঃখজনক।

আমার অফিস থেকে ছড়িয়েছে এটা কে বলল?

আমি অনুমান করছি। করিম সাহেব, আমার অনুমান খুব ভালো।

করিম সাহেব। আর কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা

ঘর, তবু তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। তাঁর সামনে বসা মানুষটিকে আজ এত অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? কেমন কঠিন চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ক্ষমতা মানুষকে বদলে দেয় তা ঠিক, কিন্তু এত দ্রুত বদলাতে পারে? এই লোকটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বদলে গেছে।

করিম সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমি যে ঘরে বসতাম। এ ঘরটা আপনার বেশ পছন্দ–আপনি ঐ ঘরে বসুন। নিজের মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিন।

করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর হঠাৎ পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আগের বড় সাহেবের বেলায় এ রকম কখনো হয় নি। আজ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটা কী? তিনি এত ভয় পড়েছেন কেন?

করিম সাহেব।

জ্বি স্যার।

আমাদের বেশ বড় একটা সরকারি বিল দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নুরুল আফসার সাহেব দেশ ছাড়ার আগে ঐ বিল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন–কোন বিলটির কথা বলছি বুঝতে পারছেন?

পারছি।

আমি ঐ বিলের টাকার অর্ধেকটা একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করতে চাই।

বলুন স্যার কী কাজ।

আমাদের এত বড় কনস্ট্রাকশন ফার্ম— বাড়িঘর সমানে তৈরি করে যাচ্ছি। যাচ্ছি না?

যাচ্ছি।

অথচ আমাদের কর্মচারীদের কোনো কোয়ার্টার নেই। ভাড়া বাসায় তারা থাকে। তাদের বেতনের একটা বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়ায়। আমি চাই থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের প্রতিটি কর্মচারীর জন্যে ফ্ল্যাট হবে। কাউকেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে হবে না।

অনেকগুলো টাকা ব্লকড হয়ে যাবে স্যার।

হোক। কত দ্রুত কাজটা করা যাবে বলুন তো? মালিবাগে আমাদের কিছু রিয়েল এস্টেট আছে না?

আছে।

ঐখানেই ফ্ল্যাট উঠুক। তিন ধরনের ফ্ল্যাট হবে। প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের জন্যে এক ধরনের, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে এক ধরনের, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ধরনের। আমি চাই কাজটা যেন দ্রুত শেষ হয়। দ্রুত। আমার হাতে সময় বেশি।

সময় বেশি নেই বলছেন কেন?

আমি অসুস্থ এটা আপনার চোখে পড়ছে না?

চিকিৎসা তো স্যার হচ্ছে। কিডনি ট্র্যান্সপ্লেন্ট হবে, তখন আর সমস্যা থাকার কথা

তা ঠিক! আচ্ছ। আপনি এখন উঠুন। বিকেলের দিকে একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে ঠিক করব কীভাবে কী করা যায়।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

করিম সাহেব চলে যাবার পরপরই কুদ্দুস ঢুকল হাসিমুখে। তার হাতে কাঁঠাল আকৃতির দুটি পাকা পেঁপে। সে স্যারের জন্যে নিয়ে এসেছে। কুদ্দুস মাথা চুলকে বলল, গাছের পেঁপে স্যার।

তাই নাকি?

বাবার নিজের হাতে পোঁতা গাছ।

ভালো, খুবই ভালো–দাম পড়ল কত?

চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা জোড়া চায়–চল্লিশে দিল।

মনজুর হেসে ফেলল। কুদ্দুসের মুখ অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে গেল। জেরার মুখে সে এক সেকেন্ডও টিকতে পারে না। তাছাড়া এই মানুষটাকে সে আগে থেকেই ভয় পায়। এখন

যেন সেই ভয় সাতগুণ বেড়েছে। ছায়া দেখলেই ভয় লাগে। মূল মানুষটাকে দেখতে হয় না।

কুদ্দুস।

জ্বি স্যার।

ওয়েটিং রুমে আমানুল্লাহ নামে একটা ছেলে বসে আছে। তাকে নিয়ে আস।

জ্বি আচ্ছা স্যার।

কুদ্দুস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আগামী এক মাস এই মানুষটার ত্রিসীমানায় সে থাকবে না। নগদ টাকা সাধলেও না।

আমানুল্লাহর সঙ্গে মনজুরের আগে একবার দেখা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আজ সে আমানুল্লাহকে আসতে বলেছে। আজ তাকে টাকা দেয়ার কথা। মনজুর রাজি আছে আমানুল্লাহর শর্তে। নগদ এক লক্ষ টাকা আগেই দেয়া হবে।

আমানুল্লাহ আজ সুন্দর একটা শার্ট পরেছে। চুল আঁচড়ানো। ইস্ত্রি করা প্যান্ট। সকালবেলাতেই গোসল করেছে বলে বোধহয় তাকে সুন্দর লাগছে। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ ভাব।

কেমন আছ আমানুল্লাহ?

জ্বি স্যার ভালো।

মনজুর ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, তোমার টাকা এখানেই আছে। পাঁচশ টাকার নোট দিয়েছে। তুমি গুণে নাও।

আমানুল্লাহ টাকা গুনছে।

মনজুর বলল, তুমি কিছু খাবে?

জ্বি না।

চ-টাও খাবে না?

না।

টাকা গোনা শেষ হয়েছে। প্যাকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে আমানুল্লাহ বলল, আমি একজনকে টাকাটা দেয়ার জন্যে তিন চারদিনের জন্যে বাইরে যাব। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন। আমি পালিয়ে গেছি। এই জন্যে বললাম।

মনজুর বলল, আমি এ রকম কিছুই ভাবব না।

আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। যেদিন যেতে বলবেন আমি যাব। শুধু ...

শুধু কী?

না কিছু না।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

ভয়? হ্যাঁ একটু পাচ্ছি।

cror’?

মনে হচ্ছে অপারেশনে আমি মারা যাব।

তাই যদি মনে হয় তাহলে রাজি হলে কেন?

টাকাটা আমার খুবই দরকার।

মরে যাবে জেনেও টাকার জন্যে তুমি রাজি হচ্ছে?

জ্বি। অবশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মানুষতো আর সারাজীবন বেঁচে থাকে না। এক সময় না এক সময় মরতে হয়। আগে আর পরে—এই আর কী। আচ্ছা আমি যাই।

তোমার সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দি। গাড়ি নিয়ে যাও–এতগুলো টাকা সঙ্গে নোবে!

অসুবিধা নেই। কেউ বুঝবে না আমার কাছে এত টাকা–স্নামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

মনজুর চুপচাপ বসে আছে। তার খুব খারাপ লাগছে। মন খারাপ শুধু না, শরীরও খারাপ। বমি ভাব হচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা। কুদ্দুস। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢোকাল। মনজুর বলল, কিছু বলবে কুদ্দুস?

স্যার পেঁপে কেটে দিব?

না। তোমার দেশের বাড়ির পেঁপে পরে খাব।

আপনার কি স্যার শরীর খারাপ লাগছে?

হুঁ।

বাসায় চলে যাবেন?

তাই ভাবছি।

গাড়ি বের করতে বলব স্যার?

মনজুরের মনে পড়ল এখন তার দখলে একটা গাড়ি আছে যে গাড়িতে চড়ে সে এখন সারা শহর ঘুরতে পারে।

অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে

অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে।

তেমন কিছু করার নেই। সেজেগুজে বসে থাকাই মনে হচ্ছে কাজের প্রধান অংশ। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। দুটি প্রধান দল আছে অফিসে। জি.এম. সাহেবের দল, এন্টি জি.এম. দল। দুদলই চেষ্টা করছে মীরার মন ফেরাতে। এন্টি জি.এম. দলের প্রধান–মোসাদেক সাহেব একদিন মীরাকে অফিস কেন্টিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন এবং নানান কথার ফাঁকে এক সময় নিচু গলায় বললেন, আপনার বয়স অল্প, আপনাকে একটা কথা বলছি শুনে রাখুন, জি.এম. সাহেব যদি গাড়িতে লিফট দিতে চান–এভয়েড করবেন। কী জন্যে এভায়েড করতে বলছি জিজ্ঞেস করবেন না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।

মীরা হেসে বলল, ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।

মোসাদেক সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মীরা শোনার জন্যে অনুরোধ করবে, তখন রসিয়ে গল্পটা বলা যাবে।

মিস মীরা, আপনি আছেন যখন সবই শুনবেন। এইসব হচ্ছে ঘরের কথা। কাউকে বলাও যায় না—সহ্য করাও যায় না।

জি.এম. সাহেবকে মীরার বেশ পছন্দ হলো। ভদ্রলোক হাসিখুশি। মহিলা কর্মচারী আশপাশে থাকলে তার হাসিখুশির পরিমাণটা বেড়ে যায়। এছাড়া অন্য কোনো দোষ মীরার চোখে পড়ল না।

জি.এম. সাহেব মীরাকে বললেন, আপনি কি রিকশায় যাওয়া-আসা করেন?

জ্বি সার, তবে মাঝেমধ্যে ভাইয়ের গাড়িতে আসি।

ভবিষ্যতে আর রিকশায় যাওয়া-আসা করবেন না। অফিসারদের আনা-নেয়ার জন্যে গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে যাবেন-আসবেন। মাঝে মধ্যে আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললেই হবে। আমি ঐদিক দিয়েই যাই।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কাজকর্ম কেমন লাগছে?

ভালো। অবশ্যি কাজকর্ম তেমন কিছু তো নেই।

হবে। ধীরে ধীরে হবে। আপনার পোস্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই পোস্ট আগে ছিল না। মইন সাহেবের জন্যেই ক্রিয়েট করা। ইনি আপনার কে হন?

দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

খুব চমৎকার মানুষ। তাই না মিস মীরা?

জ্বি চমৎকার মানুষ।

শুনলাম। তিনি বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন না। দেশে সেটেল করবেন। শুনে ভালো লাগল। তার মতো একটিভ, ইনোভেটিভ মানুষ হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশ গড়ার কাজে এদের মতো লোক দরকার–তাই না?

মীরা কিছু বলল না।

মইন ফিরে যাচ্ছে না, দেশেই থাকছে–এই খবর তার জানা ছিল না। মীরার সঙ্গে শেষ দেখা জার্মান কালচারাল সেন্টারে। মীরার ধারণা ছিল। উনি চলে গেছেন। মীরা অবশ্যি খোঁজ নেয় নি। একবার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। কেন জানি খোঁজ নিতে ইচ্ছা! করে নি।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মীরার এখন এই সময় যাচ্ছে। ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কিছু ভালো লাগছে না। কখনো কখনো তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়–আমার কিছু ভালো লাগছে না। কিছু না। সে অনেক চিন্তা করেছে, এরকম হচ্ছে কেন? মনজুরের অভাব কি সে বোধ করছে? তা তো না। তার জীবনের শূন্য অংশ মনজুর ভরাট করতে পারে নি। কাজেই তার অভাবে কাতর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য কোনো ব্যাপার। কী ব্যাপার তা সে ধরতে পারছে না। নিজেকে সে যতটা বুদ্ধিমান ভাবত এখন মনে হচ্ছে সে ততটা নয়। তার সমস্যাটা কেউ ধরে দিতে পারলে চমৎকার হত। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে কেমন হয়। আছে এমন কেউ? তাকে গিয়ে সে কী বলবে? ছোট বাচ্চাদের মতো বলবে–'আমার কিছু ভালো লাগছে না।' রোগ হয়েছে। আপনি সারিয়ে দিন।

মীরার অফিস ছুটি হয় চারটায়।

ছুটির পরপর তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না–বাসায় ফিরে সে কী করবে? নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে?

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তাঁর বন্ধুবান্ধব নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে গল্প বেশিদূর চালানো যায় না। মেয়েলি গল্পের বাইরে তারা যায় না কিংবা যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সে সব সময় দূরে দূরে থেকেছে। এখন আরো বেশি দূরে থাকতে ইচ্ছা করে। তাদের কারো সঙ্গে দেখা হলেই অস্বস্তি, চট করে বিয়ে ভাঙা সমস্যায় চলে আসেন। সমস্ত চোখে-মুখে বিষাদের ভঙ্গি এনে বলেন–বুঝলি মীরা সবই কপাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে জীবন শুরু করা। কী আর করবি? বেঁচে তো থাকতে হবে।

নতুন সংসার যাতে শুরু করতে পারে সেই দুশ্চিন্তাতেও তার আত্মীয়স্বজন অস্থির। প্রায়ই খোঁজ আনছেন, ছেলের ছবি নিয়ে আসছেন। যে ছেলে আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

মীরার ছোট ফুপু এক ছেলের খোঁজ আনলেন–খুব নাকি চমৎকার ছেলে। ভালো বংশ, ভালো টাকা পয়সা, ভালো চেহারা। ছেলের আগে বিয়ে হয় নি, এখন বিয়ে করতে চায়। তবে কুমারী মেয়ে নয়, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।

মীরা বলল, এই ছেলে তো পাগল। আপনি শেষ পর্যন্ত একটা পাগল ছেলের খোঁজ আমার জন্যে নিয়ে এলেন?

ফুপু চোখ কপালে তুলে বললেন, পাগল বলছিস কী? স্মার্ট ইয়াং ছেলে, সুন্দর চেহারা।

স্মার্ট ইয়াং ছেলে বিধবা ছাড়া বিয়ে করতে চায় না–এর মানে কী? ছেলে কি বিদ্যাসাগরের চ্যালা?

এখনই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? আগে ছেলের সঙ্গে কথা বল। তারপর রাগারাগি করবি।

আমি ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বলব না। তোমার সঙ্গেও না। তুমি আর এ বাড়িতে এস না।

তোর নিজেরই মাথাটা খারাপ হয়েছে মীরা।

তা ঠিক। মাথা আমার নিজেরই খারাপ।

এই সন্দেহ আজকাল মীরার হচ্ছে। তার কি মাথা খারাপ? এমন কিছু কি তার মধ্যে আছে যার জন্যে তার লজিক মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়? আছে। নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্কের সেই অংশটা কি ঠিক করা যায় না?

জি.এম. সাহেব বললেন, মিস মীরা আজ আমি সাড়ে তিনটার দিকে অফিস থেকে বেরুব। একটা বিয়ের পার্টি আছে। গিফট কিনতে হবে। ভলো গিফট কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?

মীরা বলল, ভালো বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

ভালো মানে, যা দেখে তারা এপ্রিসিয়েট করবে। আমার রুচির প্রশংসা করবে।

মীরা বলল, আজকাল রুচিটুচি কেউ দেখে না। উপহারটার দাম কত তাই দেখে। আপনি দামি একটা কিছু কিনে দিন তাহলেই হবে।

কী দেব বলুন তো?

আপনার বাজেট কত স্যার?

হাজার খানিক। এরচে' কম হলেই ভালো।

শাড়ি দিয়ে দিন।

আপনি কি আমাকে পছন্দ করে দিতে পারেন? অবশ্যি আপনার যদি সময় থাকে। আমার আবার রুচি বলে কিছু নেই। একবার আমার স্ত্রীর জন্যে একটা শাড়ি কিনেছিলাম। শাড়ি দেখে সে বলল–এটা লুঙ্গির কাপড়। আমি নাকি থান থেকে সাড়ে তিন গজ লুঙ্গির কাপড় কিনে এনেছি।

মীরা হাসল।

পুরনো রসিকতা। সব স্বামীই স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা নিয়ে এই একটি রসিকতাই করে। এবং মনে করে খুব উচ্চ শ্রেণীর রসিকতা করা হলো।

মিস মীরা।

জ্বি স্যার।

আমার স্ত্রী, অন্য দশজন মানুষের স্ত্রীর মতো না। অন্য দশজন শাড়িটাকে লুঙ্গির কাপড় বলে খানিকক্ষণ চিৎকার চেচামেচি করবে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেই শাড়ি পরে বলবে– পরার পর তো ভালোই দেখাচ্ছে! তোমার রুচি খুব খারাপ না।

আপনার স্ত্রী কী করলেন?

সে ঐ শাড়ি কেটে আমার জন্যে তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে দিল। সে লুঙ্গি আমাকেই পরতে হলো।

মীরা কিছু বলল না। সাধারণ রসিকতার গল্প এখন সেনসেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভালো।

আপনার কি সময় হবে মিস মীরা? জ্বি স্যার হবে। তাহলে চলুন যাই। শাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না–শাড়িটাড়ি মধ্যে আর ঐ কেনে। খুব আগ্রহ নিয়ে কেনে। তবে আজকেরটা কিনবে না। কারণ কি জানেন?

জ্বি না।

অনুমান করতে পারেন?

না—তাও পারছি না।

যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে সে আমার দিকের আত্মীয়। আমার দিকের আত্মীয়ের কোনো কর্মকাণ্ডে সে থাকবে না। বিয়েতেও সে যাবে না–সাজগোজ সে করবে। ঠিকই। গাড়িতে উঠার আগ মুহূর্তে বলবে–মাথা ধরেছে, বমি বমি লাগছে। বলেই ছুটে বাথরুমে ঢুকে গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে–থাক যেতে হবে না। এই হচ্ছে আমার জীবন। অনেক কথা আপনাকে বলে ফেললাম, চলুন যাওয়া যাক।

শাড়ি কেনা হয়ে গেল পনের মিনিটে। দোকানদার কয়েকটা শাড়ি মেলে ধরল। মীরা সাদা জামদানির উপর নীল লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল— এইটা নিন স্যার। চমৎকার।

জি.এম. সাহেব বললেন, আরেকটু ঘুরেফিরে দেখলে হয় না?

শুধু শুধু হাঁটহঁটি করে কোনো লাভ নেই–এটা ভালো শাড়ি। আপনি আমার রুচির উপর ভরসা করেছেন–এটাই নিন। আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বইয়ের দোকানে খানিকক্ষণ ঘুরব।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি।—তারপর আপনাকে নামিয়ে দেব।

স্যার কোনো দরকার নেই।

মীরা বইয়ের দোকানগুলাতে বেশ কিছু সময় কাটাল। তিনটা বই কিনল— তিনটিই কবিতার। বই তিনটিই তার আছে। তবু কিনল কেন কে জানে? মানুষের কিছু কাজকর্ম আছে চট করে যার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। অবচেতন মনে কোনো ব্যাখ্যা হয়তো আছে যা এই মুহূর্তে মীরা নিজেও জানে না।

মীরা ঘড়ি দেখল। মোটে চারটা বাজে। কী করা যায়? মনজুরের খোঁজে কি একবার যাবে? অফিস ছুটি হয়ে গেছে। তাকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে না। আগের বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। বাসা বদলে সে তার মেজো মামার কাছে গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে। তবে ঐ লোকটিকে তার নিতান্তই অপছন্দ। অশিক্ষিত, অশালীন গ্রাম্য ধরনের মানুষ। মনজুরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে মীরা যখন তার বাবার বাড়িতে চলে এসেছে তখনকার ঘটনা। বদরুল আলম এক সন্ধ্যাবেলায় দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। অতি নম্র গলায় বললেন, মা'র কাছে ছেলের একটা আবদার। আবদার রক্ষা না করলে ছেলে এই বাড়ি থেকে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাতি দিয়ে টেনেও ছেলেকে নড়াতে পারবে না মা।

মীরা শুকনো গলায় বলেছে— বলুন কী আবদার।

মনজুরের কাছে শুনলাম–তুমি ওকে ছেড়ে এই বাড়িতে চলে এসেছি। এখন মা জননী তুমি আমার সঙ্গে চল। বাইরে একটা বেবীট্যাক্সি আছে। দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বাইরে বেবীট্যাক্সি আছে?

হ্যাঁ মা।

দেখুন মামা, আমি রাগের মাথায় হুট করে চলে আসি নি। আমি পুরো এক বছর এটা নিয়ে চিন্তা করেছি। ভেবেছি। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুরের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুর কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?

না–আমি নিজেই এসেছি। মনজুর যদি শোনে সে রাগ করবে। তাকে তুমি এই বিষয়ে কিছু বোলো না।

আমি কিছুই বলব না। আপনি চা খান। চা খেয়ে চলে যান।

বদরুল আলম সাহেবের নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলার ছিল। সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। মীরার শীতল চোখের সামনে সব এলোমেলো হয়ে গেল। চা না খেয়েই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার এলেন সঙ্গে দু কেজি মিষ্টি। তৃতীয় দিন আবার সঙ্গে সেই মিষ্টি।

মীরা বাধ্য হয়ে মনজুরকে বলল সে যেন তার মামাকে সামলায়। নির্বোধ ধরনের মানুষকে সামলানো বড়ই কঠিন কাজ।

সেই মামার কাছে মনজুরের খোঁজে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করবেন। ভেবে বসবেন–সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে; আবারো হয়তো লোক পাঠিয়ে দু কেজি মিষ্টি আনাবেন। কোনো দরকার নেই। তারচে’ মইনের কাছে

যাওয়া যেতে পারে। তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এই চাকরিটি তার কারণেই হয়েছে। সেই হিসেবে ধন্যবাদ তো তার প্রাপ্য।

নিউ মার্কেট থেকে বের হয়ে মীরা রিকশা নিল। রিকশায় উঠতে উঠতে মনে হলো–ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না। বেঁচে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো–সব অর্থহীন মনে হচ্ছে–কী যেন সেই কবিতাটা?

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়...

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন আম্মা?

মীরা চমকে উঠল। এত মিষ্টি গলায় অনেক দিন তাকে কেউ আম্মা ডাকে নি। অজানা অচেনা অপুষ্টিতে জড়োজড়ো বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা এত মিষ্টি করে তাকে আম্মা ডাকিল? এত মমতা ছিল তার গলায়?

মীরা বলল, আপনি সোজা যেতে থাকুন। আমি আপনাকে বলব।

জ্বি আচ্ছা আম্মা। মীরার মন ভালো হতে শুরু করেছে। কেন?

মীরা জানে না। মইনের বাসায় যাবার আগে একবার কি মনজুরের অফিস দেখে যাবে? এত বড় কোম্পানির মালিক সে, নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজতেই বাসায় চলে যায় না। তাকে নিশ্চয়ই অনেক কাগজপত্র সই করতে হয়।

আসব?

মনজুর হাসিমুখে বলল, এস।

তোমার বসগিরি দেখতে এলাম।

খুব ভালো করেছ।

শরীর কেমন?

ভালো। মাঝখানে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডায়ালিসিস করার পর ঠিক আছে। সেই সঙ্গে চলছে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা—'নলাদি ক্কাথ' খাচ্ছি।

'নলাদি ক্কাথ'টা কী জিনিস?

গোবর পানিতে গুললে যে বস্তু হয় তার নাম নলাদি ক্কাথ, কিডনির মহৌষধ বলতে পার।

এখন তাহলে আয়ুর্বেদী চিকিৎসাও চলছে?

যে যা বলছে তাই করছি। একজন হালুয়া ঘাট থেকে পীর সাহেবের পানি পড়া এনে দিলেন–তাও খেলাম।

কেন করছ এসব?

আগ্রহ করে তারা নানান চিকিৎসার কথা বলে। তাদের খুশি করার জন্যে কিছুতেই না করি না। মানুষকে খুশি করতে আমার ভালো লাগে। তুমি কিছু খাবে মীরা?

না।

পেঁপে খেতে পারো। কুদ্দুস নামে আমার এখানে একজন কর্মচারী আছে–সে রোজ নিউ মার্কেট থেকে পেঁপে কিনে এনে বলছে, নিজের গাছের পেঁপে স্যার। বাবার হাতে পোঁতা গাছ। কুদ্দুস খুব পিতৃভক্ত। তার সব গাছই থাকে বাবার হাতে পোঁতা।

মীরা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, রসিকতা করার চেষ্টা করছি বলে মনে হয়।

রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না?

না। আজ তাহলে উঠি।

মীরা উঠে দাঁড়াল।

মনজুর দুঃখিত গলায় বলল, সত্যি সত্যি উঠছ? বস না একটু। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও।

এক জায়গায় যাব। দেরি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পর রিকশায় যেতে ভয় ভয় লাগে।

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে–যেখানে যেতে চাও নিয়ে যাবে।

ও আচ্ছা, তোমার তো এখন গাড়ি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে খানিকক্ষণ বসা যায়। বল, চা আনতে বল। ভালো কথা, ডোনার পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ। নাম আমানুল্লাহ।

মীরা অতি দ্রুত চা শেষ করে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল। মনজুর বলল, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যাবে কোথায়–মইন সাহেবের কাছে?

মীরা খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি উনাকে চেন?

উনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন।

কী জন্যে?

এমনি বোধহয় এসেছিলেন। কথাবার্তা বলার জন্যে।

মীরা নরম গলায় বলল, তাঁর প্রতি এক সময় আমার ভয়ঙ্কর রকম টান ছিল তা কি উনি বলেছেন?

মনজুর হেসে বলল, সবই বলেছেন। কিছুই বাদ দেন নি। আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয়। ভদ্রলোক তোমাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান। তোমাকে কী করে বলবেন বুঝতে পারছেন না।

তুমি তোমার উর্বর মাথা থেকে এটা বের করলে?

হ্যাঁ। আমার কিডনি ফেল করতে পারে, ব্রেইন ফেল করে নি।

করেছে। কারণ তুমি জান যে মইন ভাই তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে খুব সুখে আছেন।

মনজুর সহজ গলায় বলল, আমি যতদূর জানি তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে লুসিয়ানায় চলে যাবার পরই তিনি দেশে এসেছেন। ফিরে যাবেন না বলেই এসেছেন।

উনি নিজে তোমাকে বললেন?

হ্যাঁ। এবং আমার কি মনে হয় জান মীরা, আমার মনে হয় তোমার উচিত তাঁকে বিয়ে করা। এই ভদ্রলোকের প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড মোহ ছিল তার সবটাই এখনো আছে। আছে বলেই আমার সঙ্গে থাকতে পারলে না। আমার মধ্যে তুমি মইন সাহেবের ছায়া দেখতে চেয়েছিলে। তা কি সম্ভব? আমি হচ্ছি আমি।

মীরা কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠেও চুপ করে রইল। মনজুর বলল, মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি। সরি।

মীরা বলল, সরি হবার কিছু নেই।

মনজুর বলল, তোমার মোহ প্রসঙ্গে যা বললাম তা কি ভুল?

না, ভুল না।

ভুল না হলে তুমি এত লজ্জিত বোধ করছ কেন?

লজ্জিত বোধ করছি না তো!

করছি। খুব মন খারাপ করেছ। প্লিজ মন খারাপ করবে না। আমার সঙ্গে তিনটি বছর তোমার খুব খারাপ কেটেছে। খারাপের পর ভালো আসে। সামনের দিনগুলো তোমার ভালো যাবে। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত।

মনজুর মীরাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মইন বারান্দায়

মইন বারান্দায় কাগজ, কেচি এবং গাম নিয়ে এসেছে। তৈরি করছে কাগজের এরোপ্লেন মডেল। তার সামনে একটা বই খোলা। বইয়ে লেখা মাপমতো প্রতিটি মডেল তৈরি হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাকে ঘিরে নানান বয়সী কিছু বাচ্চাকাচ্চা বসে আছে। তাদের বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সীমাহীন।

মইন মীরাকে দেখে সহজ গলায় বলল, এস মীরা, এস। প্লেন বানাচ্ছি। মইনের গলায় কোনো বিস্ময় নেই। মনে হতে পারে সে এই মুহুর্তে মীরার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত না হবার অভিনয় দুরূহ অভিনয়। এই মানুষটি সেই অভিনয় এত চমৎকার করছে কী করে? নাকি সে আসলেই বিস্মিত হয় নি। ধরেই নিয়েছিল মীরা যেকোনোদিন আসবে। মইন কাগজ কাটতে কাটতে বলল, এই মোড়াটায় আরাম করে বাস। আমার চারপাশে যারা বসে আছে তারা আমার নেফিউ এবং নিস। এদেরকে আমি এই মুহূর্তে এরোডায়নামিক্স শিখাচ্ছি। সামান্য কাগজের তৈরি প্লেন বাতাসে ভর করে কুড়ি থেকে পঁচিশ গজ যেতে পারে যদি ঠিক ডিজাইনে তাদের তৈরি করা হয়। এই দেখ এটাকে দেখ–ফড়িঙের মতো স্লিম বডি, আকাশে ভেসে থাকার ক্ষমতা দেখলে তুমি হকচকিয়ে যাবে।

মইন কাগজের প্লেন আকাশে ছুড়ে মারল। সেই প্লেন সত্যি সত্যি উড়তে উড়তে বাড়ির কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে রওনা হলো। পেছনে পেছনে ছুটে গেল শিশুর দল। মইন মীরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কেমন আছ?

ভালো।

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ না। এমনি এসেছ?

এমনি এসেছি। আপনার না চলে যাবার কথা ছিল?

যাওয়া হয় নি। আরো মাসখানিক থাকব।

আমাদের জি.এম. বলছিলেন, পুরোপুরি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও নাকি আছে।

না। কথার কথা বলছিলাম। সেটাকেই ভদ্রলোক বিশ্বাস করে বসে আছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমস্যা কি জান? সিরিয়াসলি যেসব কথা তুমি বলবে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রসিকতা করে তুমি যদি কিছু কথা বল, যদি casual remarks কিছু করা সবাই বিশ্বাস করবে। চল ভেতরে বসে কথা বলি।

প্লেন বানানো শেষ?

আজকের মতো শেষ। তুমি কি অফিস থেকে আসছ?

না। নিউ মার্কেট থেকে। আমাদের জি.এম. সাহেবের সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি শাড়ি কিনলেন। আমাকে পছন্দ করে দিতে হলো।

মইন হাসিমুখে বলল, উনি নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাকে বলেছেন যে তাঁর জীবন কী রকম বিষময়। বলেন নি?

বলেছেন।

ঐ গল্পটি কি করেছেন–তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্যে শখ করে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সেই শাড়ি কেটে তিনটি লুঙ্গি বানিয়ে তাঁকে প্রেজেন্ট করলেন। এই গল্প কি শোনা হয়েছে, না শোনা হয় নি?

মীরা বলল, শোনা হয়েছে।

মইন বলল, এইসব গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সুন্দরী মহিলাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্যে এই গল্প তিনি করেন। ভদ্রলোক হার্মলেন্স। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে পারো। কোনোদিন ভুলেও সে তোমার হাত ধরবে না। সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে গল্প করার আনন্দই তাঁর একমাত্র আনন্দ। তাঁর পরিবারিক জীবনও খুব ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন রূপবতী মহিলা এবং অত্যন্ত ভালো মহিলা। মীরা তুমি মনে হয় আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেছ।

কিছুটা হকচকিয়ে গেছি তা ঠিক।

বুঝলে মীরা, পৃথিবীটা আসলে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। এখন বল তোমার পরিকল্পনা কী?

আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনার কল্যাণে চাকরি হয়েছে। আমি তার জন্যে আপনাকে থ্যাংকস্ দিতে এসেছি। এর বেশি কিছু না।

তুমি এমনভাবে 'না' বললে, যাতে মনে হচ্ছে এর বেশি কিছু হলে তোমার আপত্তি আছে। বস, আমার সঙ্গে চা খাও। চা খেয়ে চল ঘুরতে বের হই। রাতে ডিনারের পর তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমাদের জি.এম. সাহেবের মতো হার্মলেন্স। ভালো কথা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুব খারাপ। কী হয়েছে বল তো?

মীরা বলল, কিছু হয় নি, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। চা খাব তারপর বাসায় চলে যাব। কাজ আছে।

কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আর কোনো কথা নয়। আমার পরিকল্পনা কী ছিল জান? পরিকল্পনা ছিল সন্ধ্যার পর তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাব। তোমাদের বাসায় আই মিন তোমার ভাইয়ের বাসায় খবর দিয়ে রেখেছিলাম। তুমি যখন এলে তখন ভাবলাম খবর পেয়ে নিজেই এসেছি। তুমি হয়তো লক্ষ কর নি যে তোমাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হইনি। পরে অবশ্যি বুঝলাম যে নিজ থেকেই এসেছি। খবর পাও নি। এর পরেও যদি যেতে না চাও তাহলে আমার হাতে আরেকটি কঠিন অস্ত্র আছে।

কী অস্ত্র?

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এই দিনটাও ভুলে গেলে এটা খুবই দুঃখের কথা। আমার ধারণা ছিল আমার জন্যে অনেকখানি আবেগ তুমি সব সময় ধরে রাখবে। ধারণা দেখা যাচ্ছে ঠিক না। তুমি সব ভুলেটুলে বসে আছ।

তাই কি ভালো না?

জানি না, হয়তো ভালো। এখন বল তুমি যাবে, না যাবে না।

চলুন যাই। তুমি খুব অনাগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হচ্ছে। আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি এই অনাগ্রহ তোমার থাকবে না।

বাজিতে আপনি হারবেন। আজকাল কোনো কিছুতেই আগ্রহ বোধ করি না।

কেন কর না তাও জানতে চাই।

জানতে চান কেন?

আজকের অনাগ্রহের পেছনে–অনেকদিন আগে আমার ঘরে যা ঘটেছিল তার কোনো যোগ আছে কিনা জানতে চাই। আমি নিজে অত্যন্ত সুখী মানুষ। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

দুজন হাঁটতে হাঁটতে রওনা হলো। মইনের ইচ্ছা অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর তারা রিকশা নেবে। রিকশায় করে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন কোনো চাইনিজ রেস্তোরায় আধো আলো আধো আঁধারে রাতের খাবার শেষ করবে।

মীরা লক্ষ করল। মইনকে অসম্ভব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে সে তার আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মীরাকে সে কোনো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে–

মীরা, জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউটে একটা ছবি কিনেছিলাম তোমার মনে আছে? নগদ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। এক্সিবিশনি শেষে ছবি নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি আর ছবি আনতে যাই নি। ঐ আর্টিস্ট যেহেতু আমার ঠিকানা জানে না–ছবি দিয়ে যেতেও পারছে না। হা-হা-হা।

এতে খুশি হচ্ছেন, কারণটা কী?

খুশি হচ্ছি কারণ আর্টিস্ট সাহেবকে এক ধরনের মানসিক কষ্ট দিতে পারছি। সে ঐদিন আমাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছিল। কঠিন অপমান। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম শোধ নেব। এখন নিচ্ছি। বেচারা এখন ছবিটা নিয়ে পড়েছে বিপদে। নিজের কাছে ছবিটা রাখতে হচ্ছে। যতবার তাকাচ্ছে ছবিটার দিকে ততবার আমার কথা মনে হচ্ছে। মনটা খারাপ হচ্ছে–টাকা দিল অথচ ছবি নিল না। কঠিন মানসিক চাপ। হা-হা-হা।

আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।

অদ্ভুত না-ক্রয়েল। নিষ্ঠুর। শুধু সদ্‌গুণ নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয় না–এইসবও কিছু কিছু লাগে। যাদের ভেতর শুধু সদ্‌গুণ, মানুষ হিসেবে অনেক নিচের দিকে তাদের অবস্থান।

কী পাগলের মতো কথা বলছেন?

পাগলের মতো কথা বলছি না। ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে এই কথাগুলো বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কী বলছি মন দিয়ে শোন। খুব মন দিয়ে। একজন মানুষ

যার ভেতরে মহৎ গুণাবলি ছাড়া কিছুই নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই সে কী করে জান? সে আশপাশের মানুষদের অসম্ভব কষ্ট দেয়। আমরা তাকে এড়িয়ে চলি। ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাগ করি। কারণ আমরা তাকে সহ্য করতে পারি না।

মীরা থমথমে গলায় বলল, আমাকে এসব কেন বলছেন?

মইন হাঁটা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যার শেষ আলোয় মীরার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মইন হালকা গলায় বলল, বুঝলে মীরা, আমি কয়েকদিন আগে মনজুর নামের ঐ আদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এক ধরনের কৌতুহল থেকেই গিয়েছিলাম। তোমার মতো একটা মেয়ে সবার মতের বিরুদ্ধে এমন সাদামাঠা একজন মানুষকে কেন বিয়ে করল আবার ছাড়াছাড়িই বা কেন হলো খুব জানার ইচ্ছা ছিল। আমার সঙ্গে এই লোকটি প্রতিযোগিতা করেছে এবং এক অর্থে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, কাজেই তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, তাই না? কাজেই দেখা করলাম।

কেমন দেখলেন?

অন্য দশজন যা বলেছে তাই-নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ।

মীরা চাপা গলায় বলল, আপনার ধারণা ঠিক না। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ না।

মইন হেসে ফেলে বলল, প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হলো তা বললাম–সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ। তারপর অবাক হয়ে দেখি হিসেবে কী যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কী একটা জিনিস যেন মিলছে না। লোকটি পূরিপূর্ণ মানুষ না। তার মধ্যে মানুষের ত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। আমার ধারণা এই যে তার সঙ্গে তোমার বনল না তার কারণ এই।

আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন মইন ভাই। একজন মানুষের ভেতর ত্রুটি নেই বলেই তাকে আমার পছন্দ হবে না?

হ্যাঁ তুমিই তার ত্রুটিগুলো বল। তার সবচে’ বড় ত্রুটি কী যা তোমাকে সবচে’ বেশি আহত করেছে?

ভালোবাসা বলে কিছু তার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে যা ছিল তা হলো আশপাশের সবার সম্পর্কে অনাগ্রহ।

ভালোবাসার বাস হচ্ছে হৃদয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা করি কি, নানান কাণ্ডকারখানা করে তা দেখাতে চাই যেমন ফুল কিনে আনি, উপহার দেই। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে এক ধরনের ভান আছে–ভানটা হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। যে মানুষের মধ্যে এই ত্রুটি নেই সে ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করবে না।

ভালোবাসা যদি থাকে তা দেখানোয় দোষ কী?

কোনোই দোষ নেই। দেখানোই উচিত। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র একদল মানুষ আছে যাদের কাছে এই অংশটি অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। এদেরকে আমরা যখন বিচার করব তখন মানুষ হিসেবে এদের স্থান হবে অনেক পেছনে। কারণ এরা দুর্বোধ্য।

মীরা শীতল গলায় বলল, ওর সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে আপনি মহাপুরুষদের দলে ফেলে দিয়েছেন?

সামান্য কিছুক্ষণ কথা হয়েছে তা ঠিক না। প্রচুর কথা হয়েছে। আমি তাকে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেছি। কেন জানি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। করে না?

হ্যাঁ করে।

মীরা আমি তোমাকে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি কনফেশন করতে চাই এবং..

মইন থেমে গেল। মীরা বলল, থামলেন কেন, কথা শেষ করুন।

মইন খুবই নিচু গলায় বলল, অনেক আগে তুমি প্রচণ্ড ঘোর এবং প্রচণ্ড মোহ নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি। আজ যদি আমি ঠিক সেই রকম মোহ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসি, তুমি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

মীরা জবাব দিল না। তার সমস্ত হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে–আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছুই ভালো লাগছে না।

ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার

ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার।

ডাক্তাররা কখনো পুরো নামে পরিচিত হন না। শাহেদ মজুমদার সেই কারণেই এস. মজুমদার নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। এই বয়সেই প্রচুর খ্যাতি এবং অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ডাক্তার সাহেবকে মনজুরের পছন্দ। মানুষটি রসিক। রস ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম দিন মনজুর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই আমি কি মারা যাচ্ছি নাকি?

ডাক্তার সাহেব গভীর মুখে বলেছেন, হ্যাঁ যাচ্ছেন।

মনজুর যখন পুরোপুরি হকচাকিয়ে গেছে তখন তিনি বলেছেন, ভয় পাবেন না। আমরা সবাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ষাট বছর পর করে মারা যাচ্ছি–এই অর্থে বলেছি। নির্দিষ্ট সময়টুকু আপনি যাতে পান সে চেষ্টা আমি করব। এই আশ্বাস দিচ্ছি।

আজ মনজুরকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখা শেষ করে বললেন, আপনাকে কমপ্লিট বেডে চলে যেতে হবে। আগেও তো বলেছি। আপনি কথা শোনেন নি।

মনজুর বলল, কিছু ঝামেলা ছিল, শেষ করেছি। এখন লম্বা হয়ে বিছনায় শুয়ে পড়ব।

কবে শোবেন? আজ থেকেই শুরু করুন।

আপনি বললে আজই শুয়ে পড়বা। ভালো কথা ডাক্তার সাহেব, আমার এই সমস্যায় কি মাথায় গণ্ডগোল হয়?’

আপনার কথা বুঝতে পারছি না–মাথায় গণ্ডগোল মানে?

মনজুর লাজুক গলায় বলল, আমার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। হঠাৎ হঠাৎ সেই টেলিফোন বেজে ওঠে। বেজে উঠার কথা না। টেলিফোনটা অনেকদিন ধরেই ডেড। একটা ছেলের নাম ইমরুল, সে রাত দুটা আড়াইটার দিকে টেলিফোন করে। মজার মজার কথা বলে। আমি জানি এটা অসম্ভব না। আমার এক ধরনের হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমি কি ঠিক বলছি ডাক্তার সাহেব?

ঠিকই বলছেন। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেড়ে গেলে হেলুসিনেশন হতে পারে। এরকম ঘটনার নজির আছে। ছেলেটার সঙ্গে কী কথা হয়?

ছেলেমানুষি ধরনের কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।

হয়তো পুরো ব্যাপারটা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।

তাও হতে পারে।

শেষ কবে টেলিফোন পেলেন?

গতকাল রাত তিনটার দিকে। সে বলল, যে ছেলেটি আপনাকে কিডনি দিচ্ছে তার একমাত্র কিডনিটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে কী করবে?

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, আপনার কথা শুনে তো মনে হয় না। ঐ ছেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না। সে তো বেশ সিরিয়াস ধরনের কথা বলেছে। এই কথাগুলো নিশ্চয় আপনার মনেও আছে। আছে না?

জ্বি আছে।

এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না। আপনার সাব-কনশাস মাইন্ড আপনাকে নিয়ে খেলছে। এটাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তা দিচ্ছি। গুরুত্ব দেয়ার কারণও আছে। আমি কি কারণটা আপনাকে বলব?

বলুন।

কারণটা কোনো একজনকে বলা দরকার। আমি বলার মতো কাউকে পাচ্ছি না। সবাই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না।

ডাক্তার সাহেব নরম গলায় বললেন, আমি আপনার কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি। আপনি ধীরেসুস্থে বলুন।

আমি আমানুল্লাহ ছেলেটির সঙ্গে নিজের খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। সে একটি কিডনি বিক্রি করেছে। আমিও তাই করেছিলাম। আপনাকে এই তথ্য আগেই দিয়েছি। বাবার চিকিৎসার জন্যে এটা করতে হয়েছিল। তার থ্রোট ক্যানসার হয়েছিল। ক্যানসার হয়েছে জানার পর

থেকে তিনি বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলেন। তার ধারণা হলো বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করলেই তিনি সেরে উঠবেন। টাকা টাকা করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ বলতেন, এক লাখ টাকা হলেই বিদেশে গিয়ে জীবনটা রক্ষা করতাম। এই সময় আমি বাবাকে এক লাখ টাকা দেই। টাকা হাতে নেয়ার দুদিনের মাথায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তখনো আপনার কিডনি কেটে বাদ দেয়া হয় নি?

জ্বি না। আমি ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত দিতে পারতাম, বলতে পারতাম। আমি কিডনি বিক্রি করতে চাই না। তা করি নি। যথাসময়ে কিডনি ট্রান্সপ্লেন্ট হয়। যাকে ঐ প্রসঙ্গ আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমানুল্লাহ্ নামের ছেলেটিরও একই ব্যাপার ঘটছে। সে একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং একসময় দেখা যাবে আমার মতো সমস্যা হয়েছে।

তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।

কম হলেও তো আছে। আছে না?

ডাক্তার জবাব দিলেন না।

মনজুর বলল, আপনার এখানে কি একটা সিগারেট খেতে পারি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডাক্তার সাহেব–আমি ঐ ছেলেটির কিডনি নেব না। যে ক'দিন বাঁচব নিজের যা আছে তা নিয়েই বাঁচব।

এই সিদ্ধান্ত কি এখন নিলেন?

না। যেদিন আমানুল্লাহকে নগদ এক লাখ টাকা গুনে গুনে দিলাম। সেদিনই নিয়েছি। ডাক্তার সাহেব, আমার শরীরটা এখন বেশ খারাপ লাগছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন আমি আজ রাতেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই–অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। জ্বর আসছে বলেও মনে হচ্ছে। প্লিজ একটু দেখবেন আমার গায়ে টেম্পারেচার আছে কিনা?

মনজুর ডাক্তারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার সাহেব সেই হাত ধরলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মনজুরের দিকে। সেই চোখ কোমল ও শান্ত। অস্থিরতার কোনো ছাপ চোখের মণিতে নেই।

মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়

মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়।

এই খবর জাহানারা পেয়েছে গতকাল রাতে। ফরিদ এসে খবর দিয়েছে। জাহানারা তৎক্ষণাৎ ফরিদকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে–ফরিদ এসব কী বলছে স্যার?

মনজুর বলল, ও যা বলছে ঠিকই বলেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিয়েছি। এর নড়চড় হবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ করো না বা কান্নাকাটিও করো না।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে গেল। এ রকম হতে পারে সে কল্পনাও করে নি। জাহানারা থাকতে থাকতেই বদরুল সাহেব এলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি রাগী গলায় বললেন, তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ।

ঐ এক লাখ টাকার কী হবে? ঐ টাকা তো আর উদ্ধার হবে না।

তা হবে না। মামা, টাকাটা আমি দান করেছি।

তুই পাগল, ষোল আনা পাগল।

মনজুর ক্লান্ত গলায় বলল, মামা আমার শরীরটা খুবই খারাপ। তোমার চিৎকারে আরো খারাপ হচ্ছে। দয়া করে বিদেয় হও।

বদরুল আলম নড়লেন না। জাহানারা বের হয়ে এল। ফরিদকে হাসপাতালে রেখে একা এল মীরার কাছে।

জাহানারা মীরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সারা পথই সে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার চোখ ফোলা। মুখ অসম্ভব বিষণ্ন।

মীরা বলল, আমি বললেই কি মনজুর আমার কথা শুনবে?

জাহানারা ধরা গলায় বলল, হ্যাঁ আপনি বললে শুনবে।

আপনি কী করে জানেন?

আমি জানি। আপনি স্যারের হাত ধরে যদি একবার বলেন, স্যার রাজি হবেন। কিডনি আমি দেব। সেটা কোনো সমস্যাই না। আপনি শুধু স্যারকে রাজি করবেন। বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।

সেটা আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও জানে না। ওর কিছু নিজস্ব বিচিত্র লজিক আছে। সে ঐ লজিকে চলে। অন্য কারো কথাই শোনে না। আমার কথাও শুনবে না।

আপনার কথা শুনবেন। আপনার কথা না শুনে স্যারের উপায় নেই।

এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছেন?

স্যারের রাইটিং প্যাডের একটা পাতা আমি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। ঐটা দেখলেই আপনি বুঝবেন তিনি আপনার কথা ফেলবেন না।

জাহানারা রাইটিং প্যাডের একটা পাতা মীরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সেখানে গুটি গুটি করে অসংখ্যবার লেখা–মীরা, মীরা, মীরা।

জাহানারা বলল, মোট তিনশ ছ'বার লেখা আছে।

আপনি বসে বসে গুনেছেন?

জ্বি।

মীরা জাহানারার দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল। মীরার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। এই হাসি সে তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার স্যারকে আপনার খুব পছন্দ তাই না?

জাহানারা সহজ গলায় বলল হ্যাঁ।

কোন পছন্দ সেটা কি জানেন?

জানি।

আমাকে বলবেন?

জাহানারা স্পষ্ট স্বরে বলল, না।

মীরা বলল, আচ্ছা থাক বলতে হবে না। সবকিছু বলতে নেই। চলুন আপনার স্যারের কাছে। যাই। দেখি তাকে রাজি করানো যায় কিনা। ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয় তখন আমার পরনে আসমানি রঙের একটা শাড়ি ছিল। ঐ শাড়িটা পরে গেলে কেমন হয়।

খুব ভালো হয়।

আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি শাড়ি বদলে আসছি। আর শুনুন, এত কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখে আমারই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দেখি, কাছে আসুন তো আপনাকে একটু আদর করে দিই।